তৃতীয় অধ্যায়
চা শ্রমিকদের মিশ্র সংস্কৃতি

বরাক উপত্যকার প্রাকৃতিক শোভাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে এখানকার চা বাগানগুলি। এই উপত্যকার বিভিন্ন বাগানের মনোরম শোভা নজর কাড়ে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চা বাগানগুলির যেমন গু(ত্ব রয়েছে তেমনি এতদঞ্চলের সংস্কৃতির জগতেও ওই চা বাগানের অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন বাগানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতিকে বহন করে কাজ করে যাচ্ছে। নিজের পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসম তথা বরাককে জন্মভূমি এবং কর্মভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং চা বাগানের আর্থসামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গী হয়ে নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধের প্রমাণ দিচ্ছে।

নিজ নিজ সংস্কৃতি থাকলেও বিভিন্ন বাগানে অনেকদিন থেকে একত্র বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও সংমিশ্রণ অনিবার্য। বিভিন্ন লোভ প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে অসমের বিভিন্ন বাগানে কাজ করতে আসে শ্রমিকরা। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের জন্য বরাক উপত্যকায়ও শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে একত্র বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এই মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্রে আছে চা শিল্প।

ভারতবর্ষের যে সমস্ত মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী মানুষের সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়। বরাক উপত্যকায়ও এই সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে কিছুটা মন্থর গতিতে। তবে চা বাগিচা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলের সংস্কৃতির দ্রুত রূপান্তর ঘটেছে। চা বাগানে ভারতের নানাস্থান থেকে যেসব আদিবাসী মানুষ আমদানি করা হয়েছিল তাদের প্রথমে তিন বছরের চুক্তি(তে নিয়োগ করা হত। চা শিল্পের উন্নতির প্রক্রি(য়ায় নিযুক্ত(শিল্পপতিগণ শ্রমিকদের লোভ প্রলোভন দেখিয়ে বরাক উপত্যকায় চা বাগানগুলোতে নিয়ে আসে। এজন্য দেশিয় এজেন্ট সর্দার বা আড়কাঠিদের নিয়োগ করা হত।।[১]

শিল্পপদের এগ্রিমেন্টের বাইরেও বিহার, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন বিভিন্ন লোকেরা গু(, ধোপা, পুরোহিত, কর্মকার প্রভৃতি পরম্পরাগত ঐতিহ্য আর পেশা নিয়ে, যা বরাক সুরমা উপকূলের এক অভিনব সংযোজন।

এদের ভাষা, জীবজন্তু ও কৃষি সম্বন্ধীয় লোকবি(াস, উৎসব, লেখাধূলা, গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, সাজপোষাক, খাদ্য, বাদ্যযন্ত্র বরাকের চা বাগিচা অঞ্চলের লোকচর্চায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটিয়েছে। যা এতদঞ্চলে কোনদিন ছিল না। চা বাগিচা পত্তনের সঙ্গে তাই হল নতুন মানুষের নতুন উৎসব, নতুন ভাষা।[২]

আসামের চা বাগানগুলিতে কাজ করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লোকদের চা শ্রমিক বলা হয়। এই চা শ্রমিক কিন্তু আলাদা কোন সম্প্রদায় নয়। চা শ্রমিকদের গোষ্ঠী ভেদে আচার ব্যবহার সামাজিক নিয়মনীতি, পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানগুলি পৃথক পৃথক। এদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মুণ্ডা, সাওতাল, ওরাং, চাওরা, ভূইয়া, পাহাড়িয়া, পরজা, গৌড়, বাইগা, ওড়িয়া, অসুর, ভীল, নায়েব, কোল, সবর, ব(য়া, গড়াইত, কম্প, ভূমিজ, গনজ, ভত্ত(া আদি প্রধান। অতি পরিচিত জীবনে অভ্যস্ত এই চা শ্রমিকেরা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী এই চা শ্রমিকদের আচার ব্যবহারে স্থানীয় প্রভাব ল(্য করা যায়। উজান আসামের চা শ্রমিকেরা যেমন অসমীয়া সংস্কৃতির প্রভাবযুক্ত(তেমনি বরাক উপত্যকায়ও তাদের আচার ব্যবহারে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব ল(্য করা যায়। তবে যখনই নিজস্ব কোন উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় তখন মৌলিক উপাদানে তারা নিজেদেরকে মেলে ধরেন।[৩]

বিভিন্ন গোষ্ঠীর পূজাপার্বণ —

বরাক উপত্যকার বাগানে কর্মরত শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণ পালন করে থাকেন। বিভিন্ন বাগান ঘুরে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের পূজাপার্বণ সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা থেকে প্রথমে কিছু সং(প্ত বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। বড়সিঙ্গা বাগানের ঝাউড়া মুণ্ডার কাছ থেকে জানতে পারি — মুণ্ডা জাতির লোকেরা চৈত্র মাসে 'চা(ল' বা 'চারজমবাবা' উৎসব পালন করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মাঠের ফসল তাড়াতাড়ি পেকে উঠার জন্য

‘কাদলেতা’ উৎসব পালন করেন। আশ্বিন মাসে মুণ্ডারা জম নাওয়া বা নতুন খাওয়া উৎসব পালন করেন। মাঘ মাসে ধান উঠানোর সময় তারা ‘মাঘগারাব’ নামের এক উৎসব পালন করেন থাকেন।[৪]

সাঁওতাল হল চা শ্রমিকদের অন্যতম সম্প্রদায়। এরাও বিভিন্ন পূজা পার্বণ পালন করে থাকেন। সোহরাই বা বাধনা পরব বা গো দেবতার পূজা সাওতালদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় পৌষ কিংবা কার্তিক মাসের শুক্লপ(। এটি কৃষিবিষয়ক পূজা। সাওতালদের বসন্তোৎসবের নাম ‘বাহা পরব’। শস্যের সুফলন ও রোগের প্রতিরোধ ও অরণ্যের বিপদ আপদ থেকে র(া এই পূজার আশু ল(্য। এই পূজায় (ত্রদেবতা বা বৃ(দেবতার উদ্দেশ্যে মহুয়া ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়।[৫]

চা শ্রমিকদের ওরাং নামের গোষ্ঠীর লোকেরা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে একস্থানে সমবেত হয়ে গ্রামদেবতার পূজা করেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী মন্দিরও রয়েছে। এই পূজায় সাদা পাঠা, কালো পাঠা এবং হাস মুরগি বলি দেওয়া হয়। চৈত্র মাসে তারা ‘চা(ল’ পূজা পালন করেন। এছাড়াও করম পূজা, খুটি পূজা, গাবালি পূজা ওরাংদের প্রধান উৎসব।[৬]

চা শ্রমিকদের পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ফাল্গুন চৈত্র মাসে শীতলা দেবীর পূজা দেন। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে র(া পাওয়ার জন্য এই উৎসব পালন করা হয়। তারা দুর্গা পূজা এবং কালীপূজা উৎসব হিসেবে পালন করেন। ‘মাল পাহাড়িয়া নামে অন্য একটি চা শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘জমিন পূজা’ বা ধরিত্রী পূজা নামে একটি উৎসব প্রচলিত আছে। সিংহবাহিনী দেবীকে পূজা করার একটি উৎসবও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

কল্প নামের চা শ্রমিকদের একটি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মকর সংত্র(ান্তি, দেওয়ালি, হোলি ছাড়াও পাহাড় পূজার প্রচলন আছে। চা শ্রমিকদের চাওরা নামের গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে আমপূজা, বহরপূজা, কাঠ আলু পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি উৎসব হিসেবে পালিত হয়। ‘দোল’ উৎসবেও তারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের মত আনন্দ করে থাকেন। ভূমিজ সম্প্রদায়ের চা শ্রমিকরা ‘করম’ এবং ‘টুসু’ পূজা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করেন।[৭]

বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক পরিসরকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে চা শ্রমিকরা। বাগান এলাকার সাংস্কৃতিক জীবনে উৎসবের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিসরের মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পূজা পার্বণ, ব্রতকথা ইত্যাদি। যদিও বরাক উপত্যকার 'চা' শ্রমিকদের পরব-উৎসবগুলোকে গোষ্ঠীভুক্ত(ও সর্বজনীন দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে এমন কতগুলো পূজা বা পার্বণ আছে যেগুলো পূর্বে গোষ্ঠীভুক্ত(থাকলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে সেগুলো সর্বজনীনতার আকার ধারণ করছে। বরাক উপত্যকার বাগানগুলিতে প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ল(্য করা যায়। বহুদিন থেকে একত্র বসবাস করার ফলে একে অপরের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে তারা আপন করে নিচ্ছে। একত্র সমবেত হয়ে পর্বগুলো পালন করছে।

যেমন বনদেবী বা বনদেবতার পুজোতে-জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে বাগান শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাগিচায় যে কোন কাজের শু(তে বছরের প্রথম পাতাতোলা বা সাঁকো তৈরী, 'চা' গাছ কলম করা ইত্যাদিতে বনদেবতার পূজা অবশ্য কর্তব্যজ্ঞানে শ্রমিকেরা সাতসকালে পূজাথানে জড়ো হন। এই পূজার 'থান' সাধারণত 'চা এর সারিবদ্ধ ঝোপের মধ্যেই নির্বাচিত হয়। চা বাগানের এই পরবগুলোতে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় ও অতি জাগরিত ভাবধারার পাশাপাশি শ্রমিক সাধারণের সামাজিক চেতনারও প্রকাশ ঘটে।[৮]

বরাক উপত্যকার চা বাগানে পালিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণ পালন করে থাকেন। বিভিন্ন বই, পত্রপত্রিকা এবং নানানজনের কাছ থেকে শুনা তথ্য মতে বরাক উপত্যকার বাগানে পালিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছোট বড় কয়েকটি মুখ্য পরব সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

মনসা পূজা — ছোট নাগরপুর, পশ্চিমবঙ্গ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত চা শ্রমিকেরা বরাক উপত্যকার চা বাগান এলাকায় যেসব দেবীর পূজার্চনা করেন, সেগুলির স্থান বদলের ফলে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও তাদের মূল কাঠামোটি সাঙ্গীকরণের ফলে দুর্বল হয়নি এমনি একটি পূজার নাম কাঁচাদেবী, বিষহরি বা মনসা পূজা। ঝুমুর পাণ্ডের লেখা থেকে বিষহরি পূজা সম্পর্কে জানা যায় —

‘কাওয়া করে কা কা

কোথায় গো বেহুলার মা

বেহুলা সুন্দরী কইনা জলে ভাসে যায়।’

শ্রাবণের মেঘলা দিনে সবুজ চা বাগানে মনটা হঠাৎ যেন কেমন বিষন্ন হয়ে যায়। বেহুলার দুঃখে সবাই দুঃখ অনুভব করেন। তাই মনসামঙ্গল সবার রক্তে(, মজ্জায় বহমান সাধারণ মানুষের এত প্রিয়। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবীর মতো মনসাও এমাসে পূজা পেতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সপ্তডিঙ্গা ডুবিয়ে দিতে লখিন্দরকে দংশন করতে বা বেহুলাকে জলে ভাসতে দেখেও একটু ক(ণা হয়না দেবীর। চাঁদবেনে এখানেও নাছোড়বান্দা। তারপর একসময় দেবীরই জয় হয়। চাঁদবেনে পুজো দিতে রাজি হয়।। এ গল্প প্রায় সবারই জানা। সাপের প্রতীক এখানে মনসা। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সাপের গান আছে। দুহাতে চামড় দুলিয়ে ঘাঘরা পরে নাচেন গায়ক-গায়িকা, ওঝার গান, ঢপ যাত্রাও আছে। ঘরে ঘরে মনসার পূজা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত রি, বাত্তি(, নবশাখারা প্রধানতঃ এটা পালন করেন। ইদানীং কোথাও কোথাও অন্যরাও করে। তবে প্রায় সবাই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। মনসা বা বিষহরিকে ওরা বলেন কাঁচা দেবতা মানে ভয়ের দেবতা। কিন্তু গানগুলোতে (ওরা বলেন বাণী) দেবীর প্রতি ভালোবাসা আর মমতা ঝরে ঝরে পড়ে। একজনের বাড়িতে সবাই জড়ো হয়ে গান করেন।

‘‘লাল ফুল নীল ফুল

রক্ত(ফুলের মালা

কেমনে পূজিব মাগো

চরণ কমলে

বলো লাল ফুল.....’’

শ্রাবণ মাসে বর্ষায় ভরা নদী, দেবী কি করে আসবেন?

"শ্রাবণ মাসে ভরা গাঙ

অকুল পাথার ।

কেমনে আসিবে মা

জানে না সাঁতার।"

আরেকটা ব্যাপার এখানে ল(্যনীয় যে জনজাতি বা আদিবাসীদের মধ্যে এখনও অনেক জায়গায় পুরোহিত নেই। ওরা নিজেরাই একজন ভগত (পুরোহিত) নির্বাচন করে। একজন ভগত মারা গেলে ওই জায়গায় আরেকজনকে নির্বাচন করা হয়। একটা বাগানে চার পাঁচটা পূজা হয় এবং বাগানের অনেক পরবের মতো এই অনুষ্ঠানও হয় রাতে। মেয়েরা তখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে খই ভাজে, প্রসাদ তৈরি করে, তারপর থালা সাজিয়ে পুজোর স্থানে দিয়ে আসে। কে কোন পূজায় থাকবে আগেই ঠিক করে। কেউ কেউ আবার সারারাতই এক পূজা থেকে আরেকপূজা ঘুরে বেড়ায়। ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই ঘর খালি করে পূজাতে যোগ দেয়। মনসা গান আর বাজনায় তখন বাগানের রাস্তাঘাট গাছগাছালি গম গম করে। সারারাতই একদিকে গান, অন্যদিকে পুজোর অনুষ্ঠান চলে। সন্ধ্যারাতেই সবাই বারি আনতে যায় দল বেঁধে, ভগতের ওইদিন বিরাট সম্মান। কাঁচা হলুদে চুবানো কাপড় পড়ে আগে আগে চলে ভগত। সারাবছর ওকে ধূপধূনা দেখায়। বারি এনে ঘট প্রতিষ্ঠা করেন ভগত।

"আয় মা আয় মা আমার আসরে

ধূলায় পড়ে কাতর হয়ে ডাকি মা তোমায়

বলি আয় মা...."

তারপর অনুষ্ঠান চলে সারারাত। মাঝে মাঝে ভগত বেতের গোছা দিয়ে পিঠে

আঘাত করে। এটাকে 'দেবতা খেলা' বলা হয়। পরদিন ভাসান। নারী পু(ষ সবাই মিলে ছলছল চোখে মাকে নিয়ে যায় বিসর্জন দিতে। সুরের মূর্ছনায় গাছ-গাছালি, পথ-ঘাট বিষাদে তখন তিরতির করে কাঁপে —

" কোথায় যাবি গো মা

যেতে দিব না

ধরেছি রাঙা চরণ

ছেড়ে দিব না।" [৯]

টুসু পরব বা উৎসব — টুসু রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক শস্যোৎসব। বাকুড়া, পু(লিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি অঞ্চলের গ্রাম্য পরিবেশে যে উৎসবটি জনজীবনের অতি আপন, অতি আদরের, অতি আনন্দের, তার নাম টুসু উৎসব। টুসু দেবী নন, যদিও কোথাও কোথাও পূজাও করা হয়। তথাপি টুসু দেবী নন। তাদের ঘরের একজন। তাদের পরিবারভুক্ত(মানবী মাত্র। পুরাণের সঙ্গে যোগ নেই। কোন মন্ত্র টন্ত্র নেই। টুসু নামটির উদ্ভব প্রসঙ্গে সমালোচকগণ একমত নন। প্রধান মতগুলি হল —

১। পুষ্যা ন(ত্রযুক্ত(মাস পৌষ, পুষ্যা ন(ত্রের অপর নাম তষ্য, তা থেকে তুষু>টুসু।

২। টুসু শব্দটির উদ্ভব এষা ও ওষা ব্রতগুলি থেকে। উড়িষ্যার পাহাড়ি অঞ্চলের হিন্দু ভূইয়ারা এখনও উষা বা ওষা ব্রতগুলি পালন করে। এই উষা বা ওষা শব্দটি এই অঞ্চলের কথ্য ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী টুসুতে পরিণত।

৩। কোল গোষ্ঠীর টুসা শব্দটি থেকে টুসু শব্দটি আসতে পারে।

এছাড়া সাধারণত টুসু দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভাষা বর্গের কোল, মুণ্ডা, ওরাং, সাঁওতাল,

ভূমিজ, ভূইয়া, কুর্মি, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী এবং প্রাচীন বাংলার তুষ তুষালি ব্রতই টুসুতে পরিণত হয়েছে। [১০]

টুসু অর্থ ফুল, মঞ্জরি বা কুড়ি হতে পারে। বাংলার ব্যাপক অঞ্চলে টুসুর সঙ্গে ধানের তুষের অনুষঙ্গ জুড়ে আছে। ভাদ্রমাসে যখন শস্যভারে ধানগাছগুলি আনত হয়ে পড়ে তখন এক বিশেষ দিনের প্রাতঃকালে শুদ্ধাচারে নববস্ত্র পরিধান করে যেতে হয় খেতের মাথায়। সঙ্গে থাকে একটি শাঁখ, হলুদরঙে রাঙানো একখণ্ড কাপড় ও জলের একটি (ুদ্রপাত্র। খেতের মাথায় গিয়ে আড়াই মুঠি ধান মূলের একটু উপর থেকে হলুদ বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে নিতে হয়। ধানের গাছগুলিকে নিয়ে মৌন মুখে গৃহস্থর দরজায় এসে শঙ্খধ্বনি যোগে আহ্বান করতে হয় গৃহিনীদের বরণ করার জন্য। গৃহিনীরা জলধারা দিয়ে গাছগুলিকে ধরে তুলে লক্ষ্মী বেদীর উপর রাখার নির্দেশ দেন। এই ধান আনাকে বলা হয় 'মুঠ আনা'।[১১]

টুসু পূজা একান্তভাবে মেয়েদের। চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় পৌষমাসের 'তুষ তুষলি'র পূজার সঙ্গে বিহার প্রদেশের ধলভূম সিংভূম, বাঁকুড়ার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল এবং মেদিনীপুরের উত্তর পশ্চিম অংশের টুসু পূজার মূলগত কোনও পার্থক্য নেই। হয়ত স্থানভেদে উচ্চারণ পার্থক্যে একই শব্দ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে।

টুসুর মূর্তি উচ্চতায় এক ফুট পর্যন্ত হয় এবং রূপ অনেকটা শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীর মত। মাথার পিছনে একটি চিত্রিত চালচিত্র থাকে। দিনের বেলা এর পূজা হয় না, সারা পৌষ মাস ধরে এই পূজা চলতে থাকে। বিবাহযোগ্য কুমারী মেয়েরাই এই পূজায় বেশি উদ্যোগী হয়। গ্রামের সবার ঘরে নিজস্ব একটি টুসু মূর্তি থাকলেও কোথাও কোথাও বারোয়ারিভাবেও পূজা হয়। প্রত্যেকে নিজের নিজের টুসুকে নিয়ে বারোয়ারি তলায় আসেন এবং সেখানে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গান চলে। এই গানের মধ্যে একদিকে টুসুর দেবীরূপ যেমন প্রকাশিত, অন্যদিকে আবার তাকে একেবারে নিকট আত্মীয় বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার টুসুকে কেন্দ্র করে দৃশ্যবিবাদও হয়। কেউ কেউ মনে করেন পৌষ মাস যেহেতু লক্ষ্মী মাস, তুষ মানে ধানের খোসা আর মাঠের থেকে শস্য যখন গোলায় আসে, তখনই এর পূজা হয়। 'সুতরাং এই পূজা প্রকৃতপ(

লক্ষ্মীপূজা’[১২]

গোটা পৌষমাস ধরেই টুসু উৎসব চলতে থাকে। গানই হলো টুসু উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। যে গানগুলি মুখে মুখে নির(র নারীগণ রচনা করেন সেগুলির মধ্যে তাদের লোকায়ত চিন্তাভাবনার বহিপ্রকাশ ঘটে। জমে থাকা বেদনা, হাসি কান্না পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ প্রকাশের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন চরিতার্থে চাই উপল(্য, সেই উপল(্য টুসু।

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগানে করম, টুসু এবং ফাগুয়া পরবের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। বাদ্যযন্ত্র আর যৌথ নৃত্যগীতে হেমন্ত শীত বসন্তের দিনরাত্রি শিহরিত হয় আর আনন্দে মুখরিত হয় চা বাগান।

নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে বরাক উপত্যকায় আসার সময় কৃষিশ্রমিকরা অবশ্যই তাদের বহুযুগ লালিত পালিত সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির প্রধান বাহন ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে আসেননি। বাঁকুড়া, বীরভূম, পু(লিয়া তো অবশ্যই ছোটনাগপুর, ওড়িষা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে যেসব শ্রমিক এসেছিলেন তারা সকলেই তাদের বৈচিত্রময় সংস্কৃতির সার্থক বাহক। বহুদিন, বহুবছর এমনকি শতাব্দী অতিত্র(ান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখনও তারা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেননি। যদিও বহু(ত্রে স্থানীয় প্রভাবে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বহুদেশ এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে যে বিরাট শ্রমিক বাহিনী দলে দলে বিভিন্ন সময়ে বরাক উপত্যকায় চা বাগানে কাজ করার জন্য এসেছিল তাদের সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য এমনকি প্রধান চিহ্(ায়ক হচ্ছে টুসুগান। বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলিতে যে টুসু উৎসব পালিত হয় এবং টুসু গান শোনা যায় তা বাঁকুড়া, বীরভূম, পু(লিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আগত। ইতিহাসের বঙ্কিম পথে চলতে চলতে টুসুগানে স্থানীয় জীবনের প্রভাব পড়েছে।[১৩]

বরাকের চা বাগানগুলোয় পৌষের জাঁকালো শীতসন্ধ্যায় কান পাতলেই যেখানে সেখানে শোনা যায় শুধু টুসু গান। হ্যাঁ, মেয়েদের বড় আদরের বড় ভালোবাসার টুসু আসেন কুয়াশা আর শীত মেখে। গৃহস্থের ঘরে অগ্রহায়ণের ধান উঠে। চা বাগানে ধান কাটার কাজ নেই। স্মৃতিটুকু আছে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের পু(লিয়া থেকে আগত

অনেক আদিবাসী রমণী টুসু পূজার আয়োজন করেন। তবে দীর্ঘদিন একত্র বসবাস করার ফলে অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত মেয়েরাও এতে কোথাও কোথাও আজকাল তা পালন করে থাকেন। এতে করমপূজার মতো পু(ষরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। তাই শুধু এটা আর ব্রত থাকে না। সামাজিক পরব হয়ে উঠে। তাই নাম 'টুসু' পরব।

এই পরব পৌষের প্রথম তারিখ থেকে শু(হয় এবং শেষ হয় পৌষ সংত্র(ান্তির দিন। কয়েকজন মিলে একজনের বাড়িতেই স্থান নির্দিষ্ট করে। পয়লা পৌষ থেকে নির্দিষ্ট করা বাড়িতে প্রত্যেকদিন সবাই মিলে টুসু গান করেন। প্রথমদিনই একজনকে টুসুর মা নির্বাচন করা হয়। তারপর এক কারিগরকে দিয়ে টুসু তৈরি করেন। বাঁশ, শলা, রাংতা দিয়ে কারিগর টুসু তৈরি করেন। টুসু অনেকটা ভগবানকে গোপাল ভাবে ভজনার মতো। মেয়েদের বাৎসল্য রসেরই এক প্রকাশ। সারাদিন কাজের শেষে মেয়েরা একজায়গায় জড়ো হয়ে গান করে। তারপর আসে জাগরণের রাত মানে পৌষ সংত্র(ান্তির আগের রাত ওইদিন আসল উৎসব। এর পরদিন পৌষ সংত্র(ান্তি বা মকর। মানে পিঠে পরবের দিন। ঘরে ঘরে পিঠা পরবের প্রস্তুতি সেরে নিয়ে সবাই জড়ো হয় নির্দিষ্ট স্থানে, সন্ধ্যারাতেই মেয়েরা দল বেধে গান গেয়ে গেয়ে কারিগরের বাড়িতে যায় তাদের আদরের টুসুকে আনার জন্য। তারপর আদরের ভালোবাসার টুসুকে এনে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয় —

''এসো এসো আমার টুসু

ভালো করে বসো গো

লোকে মন্দ বলে বলুক

মুখ তুলে চেওনা।''

টুসুর মাথায় ধান দুর্বা দেয় মেয়েরা। তারপর পূজা হয়। টুসুর মা এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সারাদিন উপোস থেকে টুসুর মা মিষ্টান্ন তৈরি করে টুসুকে ভোগ দেয়। সারারাতই নারী পু(ষরা মিলে গান বাজনার মাধ্যমে আনন্দফূর্তিতে মেতে উঠে। ভোররাতে সবাই মিলে আরেক টুসুর বাড়িতে মালা বদল করতে যায়। পরদিন মানে

পিঠে পরবের দিন আবার টুসুকে পূজা করে। তারপর টুসুকে ধান দুর্বা দিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। টুসুর মা টুসুকে মাথায় নেয়। সঙ্গে পু(ষরাও যায়, লোকের বাড়িতে বাড়িতে বয়স্ক মহিলারা ধান দুর্বা ফল মিষ্টি এবং পয়সা দিয়ে বিদায় জানায় টুসুকে।

" যাও যাও ওগো টুসু

পথ দেখে দেখে যাও

কাঁটা ঢুকলে গায়ে

কেউতো ছাড়বে না।"

ভাসিয়ে দিয়ে টুসুকে মায়ের ঘরে ফিরতে ফিরতে অশ্রসজল চোখে আবার অপে(া করে আরেক শীতের, আরেক কুয়াশা ভরা পৌষ পরবের।[১৪]

বরাক উপত্যকার চা বাগানের টুসু উৎসবের প্রাণশক্তি(হল তাৎ(ণিক বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ কল্পনা ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সংগীত যাতে জীবন বারমাস্যার চিত্রই ফুটে উঠে না, অন্তরঙ্গ জীবন রস স্বাভাবিকতায় পবিত্রায়িত হয়।

বরাক উপত্যকার টুসুগানে গায়িকাদের মনোগত ইচ্ছে, অস্ফূট প্রেম, বাগানের শ্রমিকের কাজের ধারা এবং তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচিত এসব গানে চা বাগান শ্রমিকের জীবনের প্রায় পূর্ণ আকল্পটি ধরা পড়েছে। শ্রমিকবাহিনীর চেতনাসন্ধানে প্রতিটি গানই এক একটি বিশিষ্ট চিহ্(ায়ক। চা গাছের পাতা তুলে চূর্ণ করে, চা প্রস্তুত করে বাগান থেকে চালান দেওয়ার কথা পাচ্ছি এই গানে —

"পাতি তুলব কলম কাটব

মাল করব চুণি চুণি

বাকসা করে চালান দেব

কলকাতা কালাপানি- চা পানি।''

ল(্যণীয় যে এসব গানে ব্যবহৃত শব্দ গুচ্ছ ও শব্দ যেমন 'পাতি তুলব', 'কলম কাটব' ইত্যাদি চা বাগানের জীবন থেকে চয়ন করা। চা শ্রমিকের জীবনযুদ্ধ এবং তার সীমাবদ্ধ আশার অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে উঠেছে অনেক টুসুগানে। [১৫]

বরাক উপত্যকার কোন কোন টুসু গানে বিশেষ কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। যদিও সাল তারিখ হয়তো তাতে নেই। এরকম একটি গান —

'চান্দ খিরাতে বান্দ ভাঙ্গিল

বলি বৈঠাখালে ঢেউ খেলে

উঠ উঠ বড় সায়েব গ

বলি জোড়া সিন্দুক যায় ভাসে।''

চান্দখিরা, বৈঠাখাল, ইত্যাদি স্থান নামের উল্লেখ থেকে এবং সিন্দুক ভেসে যাওয়ার সংবাদ থেকে মনে হয়, কোন বিধ্বংসী বন্যার স্মৃতি বহন করছে এই গান। উল্লেখ্য যে করিমগঞ্জ জেলার চান্দখিরা, বৈঠাখাল অঞ্চলটি লঙ্গাই নদীর বন্যার গ্রাসে পড়ে থাকে। [১৬]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত চা শ্রমিকের মধ্যে আরও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব প্রচলিত আছে। করমপূজা ও ঝুমুর নাচ এই প্রকারের উৎসব। সাঁওতালি নাচ প্রচলিত আছে সেইসব চা শ্রমিকের মধ্যে, যারা সাঁওতাল। আবার টুসুগান ও উৎসব যে সব চা বাগানেই শ্রুত এবং দৃষ্ট হবে তেমন নয়। ভোজপুরী শ্রমিক যারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে, টুসুপূজা বা টুসুগানের প্রচলন নেই। কিন্তু বরাক উপত্যকায় অধিকাংশ চা বাগানেই পুরো পৌষমাস

টুসুগানের মাস। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, এসব চা বাগানের শ্রমিকরা সেইসব অঞ্চল থেকে এসেছিলেন যেখানে টুসু পূজা ও টুসুগান প্রচলিত ছিল। তারা তাদের মজ্জায় বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তাদের সাংস্কৃতিক ধারাকে। বাংলাভাষায় রচিত টুসুগান এই সিদ্ধান্তকে জোরদার করে। [১৭]

করম উৎসব বা পূজা — ছন্নছাড়া অরণ্যাচারী শিকার জীবন থেকে কৃষিজীবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ থেকেই করমের উৎপত্তি। সাঁওতাল লোককথা ও সৃষ্টিতত্ত্বে করমগাছ আদিমতম বৃ(। পুরাণ ও কমুধর্মুর লোককাহিনীতে করম উৎসবের উৎপত্তির কথা ব্যত্ত(হয়েছে। এটা কোন চাপিয়ে দেওয়া ঘটনা নয়। দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আদি বংশধরদের চিরাচরিত জীবনমুখী সনাতন অনুষ্ঠানই করম। করম পালনকারী জনগোষ্ঠীর কৃষিজীবী কুড়মি জাতি অন্যতম হলেও ভূমিজ, খেড়িয়া, কামার, কুমার, বাগাল, বাজোয়াড়, ঘাটোয়াল, হাড়ি, বাউরি, ডোম, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাং, হো সকলেই পালন করে। [১৮]

বরাক উপত্যকার চা বাগানে পূজা পার্বণ লোকউৎসব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারতের একাধিক রাজ্য থেকে কর্মোপল(আগত শতসহস্র নারী পু(ষ একে অপরের পালাপার্বণ গ্রহণ করেছেন, নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে তাদের নবরূপ কাঠামোয় সাজিয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েও এক একটি উৎসব তাদের কাছে নাচে-গানে আনন্দমুখর হয়ে উঠে। এরকম একটি উৎসব হল করম পূজা।

জাগুয়া করম ও ডাল করম উৎসবের দুটি ভিন্ন অঙ্গ বিশেষ। জাগুয়া শব্দের অর্থ পুন(জ্জীবিত করণ বা ভেজানো। জাগুয়া মূলতঃ অঙ্কুরোদগমের আচার অনুষ্ঠান। জাগুয়া করম কুমারী মেয়েদের একান্তভাবে নিজস্ব ব্রতপোবাস ও উৎসব। শস্য, সন্তান, সুস্বামী কামনাই অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য।

ভাদ্রমাসের নূতন চাঁদের একাদশী তিথিতে করমপূজা হয়। যে বাড়িতে পূজা হয় সেই বাড়ির কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিত যুবতীসহ মোট পাঁচজন কুমারী উপবাস থেকে পূজা করেন। পূজার তিনদিন পূর্বে কুমার ও কুমারীগণ খুব ভোরে উঠে স্নান করে পবিত্রমনে পূজার সাজসরঞ্জাম নিয়ে নদীতে রওয়ানা হয় বালু সংগ্রহের জন্য।

নদীতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গা ও ধরতীমাতারে পূজা দেন। পূজা করে বালু নূতন টুকরীতে তুলে রাখেন। পাঁচজন কুমারীর মধ্যে যেকোন একজনের মাথায় তুলে নেচে নেচে গান গেয়ে বাড়িতে আসেন —

''আহি গেল ভাদর মাস

করমকেয় পূজরে

ধরতী মাতাতে লেগাব

জাগুয়াকে জাগাব রে।

বাড়ির উঠানে কিছুসময় নাচার পর, টুকরী সহ বালুকে ঘরের ভিতরে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হয়। সেদিনই বিকালবেলা ধান, যব, তিষি, চানা মটর, ভূট্টা, কলাই, সরিষা ইত্যাদি বালুর সাথে খুব ভালভাবে মেখে টুকরীতে রাখা হয়। সেদিন থেকে রোজ সন্ধ্যাবেলা জাগরণ নৃত্য গীতিতে আনন্দের জোয়ার উঠে। করমপূজার দিন বিকালবেলা সকলে পূজার সরঞ্জাম নিয়ে 'করম ডাল' আনার জন্য মনের আনন্দে নেচে নেচে রওয়ানা হয়। করম গাছের গোড়াতে পূজা করে, সেই গাছের ডাল কাটার সময় কুমারীগণ আঁচল পেতে রাখে। সেই ডালটিকে মাটিতে পড়তে দেওয়া হয় না। তারপর কুমারীগণ সকলে এক সাথে ডাল ধরে মাদলের তালে তালে নেচে নেচে বাড়িতে আসে। 'ওতদিন ছিলি করম বনে জঙ্গলে/ আইজরে ঘরে দুয়ারে।' উঠোনের মধ্যস্থানে একটু গর্ত করে ডালটিকে একটু পুতে খাড়া অবস্থায় রাখা হয়। তারপর আরম্ভ হয় পূজাবাড়ির কর্তার ছোটভাই উপবাস থেকে হাটু পর্যন্ত ধুতি ও কাঁধে গামছা নিয়ে যথারীতি পূজা করেন। পূজা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শু(হয় কর্মা ও ধর্মা রাজার কাহিনী। কাহিনীসহ একজন ব্যক্তি(নির্ধারিত করা হয় এবং উপস্থিত দ(ি ণাসহ নতুন গামছা ও ধুতি বাড়ির কর্তা তাকে দেন। গল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে পু(ষরা নৃত্যের সহিত মাদল ও বাঁশী বাজায়। আর স্ত্রী লোকেরা দলবদ্ধভাবে নৃত্যের গান গায়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটা সহজ ও সরল পরিবেশের মধ্যে বনফুলে সজ্জিত ছেলেদের প্রাণ মাতানো মন ভোলানো সাবলীল নৃত্যগীত এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও

উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

'বনে বনে যাওলী, বনফুল তড়লী,

হায় রাম ঘর ঘুরী আওলী।'[১৯]

ঋতুর সঙ্গে করম উৎসবের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। করম বর্ষা ঋতুর উৎসব। প্রান্তীয় বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ভাদ্রমাসে আউস ধান তোলা হয়। অনেকের মতে করম সেই ফসল তোলার উৎসব। ফসল ফলানো, ফসল তোলা বা ফসলকে অশুভ-শক্তি(র হাত থেকে বাচানোর যাদু প্রক্রি(য়াশ্রয়ী শক্তি(র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই বাঙালির ব্রত পার্বণ, এবং উৎসব সাঁওতাল, মুণ্ডা ওরাওদের করম উৎসব সেই জাতীয় ঋতুনির্ভর বা মরশুমী শস্য উৎসব। কৃষিনির্ভর আদিম মানুষ মনে করত আদি পিতা সূর্য ও আদি মাতা ধরিত্রীর মিলনে শস্য জন্মায়। তাই তাদের উৎসব প্রধানত শস্যোৎসব এবং সেগুলি সূর্য ও ধরিত্রীর উৎসব, মিলনের ইঙ্গিতবাহী। করম পরবও সেই জাতীয় একটি উৎসব। করম পূজা প্রাঙ্গণে দুটি করম ডাল পোতা থাকে। আদিবাসী সংস্কারে তারা বর কনে অর্থাৎ করম রাজা ও করম রাণী। করম রাজা সূর্যের প্রতীক আর করম রানী ধরিত্রীর প্রতীক এঁদের বিবাহ প্রভূত ফসলের সম্ভাবনার সংকেতবাহী।[২০]

আগে মোটামুটিভাবে প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি বাগানে করম পূজার আয়োজন করে থাকতেন। কিন্তু এখন দেখা যায়, কোন একটি বাগানে বিশালাকারে করম পূজার আয়োজন করা হয়। এতে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগান থেকে মানুষ আসে নির্দিষ্ট বাগানে করমপূজাতে অংশগ্রহণ করতে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বরাক উপত্যকার চণ্ডীঘাট চা বাগানে আদিবাসী চা জনগোষ্ঠীর করম পূজার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। করম পূজা এখন আর শুধু পূজা নয়, সকল জাতির মিলন(ক্রক্রপে, উৎসবের মেজাজ নিয়ে ধরা দেয়। সেই করমপূজাতে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং দেখেছি করম পূজার মাহাত্ম্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নিয়ম কানুনেরও তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। করমপূজার বিধি অনুসারে ব্রত পালন ও বাড়ির উঠানোর পর জাউয়া লাগানো হয়। তারপর জাউয়া পূজা এবং জাউয়া গাছ লাগানো হয়। এরপর পূজার মাধ্যমে করম দেবতাকে নিমন্ত্রণ নিবেদন করা হয়।

করমপূজার বিধান অনুসারে প্রতীক করম দেবতাকে আনয়ন ও স্থাপন করা হয়। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগান থেকে প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাগমে করম পূজা যেন করম উৎসবের রূপ নেয়। পূজার দিন নৃত্যগীত, নাটক এবং বিশেষ করে ঝুমুর নাচের ডালি সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়। সব নিয়মকানুন মেনে পূজার ব্রতী ও করমবাবার ভক্ত(গণ সম্মিলিতভাবে করমদেবতাকে বিসর্জন করেন।

করম পূজা উপল(্যে একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা যায় —

''চিরদিনের করমপূজা আমাদের যুগে যুগে পূজা করবই

চা বাগানের হামদের সংস্কৃতি হামরা সব দিনেই বজায় রাখব।

দুর্গাপূজা, কালিপূজা, আরও কত পূজা

সব সম্প্রদায়ের অনেক পূজা

হতে হবে করম পূজা

করম ডালের চারপাশে

মাদলিয়ার তালে তালে

করমতী ঝুমুর নাচে।

ভাদর মাসের একাদশীর রাতে

হামরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে

তালে তাল দিয়ে আস সবাই মিলি

করম পূজার সাজে।'[২১]

এখানে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিটি উৎসবই উৎপাদন প্রক্রি(য়ার সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে এই উৎসবগুলির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আদিমতর থেকে চলে আসা বাহা পরব, সহরাই পরব, সারহুল পরব, আদি পরবসমূহ উৎপাদন প্রক্রি(য়ার সঙ্গেই জড়িত। এককথায় বলা যায় জনজাতি সমূহের সামূহিক পরবসমূহ, কৃষি উৎপাদনের সঙ্গেই প্রায় সম্পর্কিত। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে করম পরব আসাম তথা কাছাড়ে সর্বজনীনতা লাভ করে সব ভাষা গোষ্ঠীর কাছে অনেক প্রভাব ফেলেছে। মূলতঃ করমপূজা রবিশস্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বলে অনুমান করা হয়। এই পূজায় লাগানো দানা শস্যগুলোকে ল(্য করলে দেখা যায় জালা করা দানাসমূহ বেশির ভাগই রবিশস্য। যেমন চানা, গম, মুগ, কলাই মটর ইত্যাদি। এই দানাসমূহ দিয়ে জাউয়া উঠায় ও করম গাছের ডাল দিয়ে পূজা করে আমোদ প্রমোদের সঙ্গে পূজা সমাপ্তের কয়েকসপ্তাহ পরেই রবিশস্য চাষেও কৃষিকাজে মনোযোগ দেয়। শ্রমিকরা করম বা কর্মা পরব ইতিমধ্যে সর্বজনীনতা লাভ করে মঞ্চে উঠে আসলেও কয়েক বছর আগেও পরিবারকেন্দ্রিক ছিল। পরম্পরাগত ভাবে ঘরের আঙিনায় হতো পূজা। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর রূপান্তর ঘটতে ঘটতে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।[২২]

জিতিয়া পরব — চা শ্রমিকদের পালিত বিভিন্ন পার্বণের মধ্যে একটি প্রধান পার্বণ হিসেবে জিতিয়াকে পালন করতে দেখা যায়। তারা নিষ্ঠা সহকারে জিতিয়া উৎসবকে পালন করে থাকেন। জিতিয়া মেয়েদের একটা ব্রত। সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়েরা এই ব্রত পালন করে থাকেন। ভাদ্র মাসে এটা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রত পালনের আগে ঘর-দোর উঠোন নিকিয়ে তকতকে করে তুলে মায়েরা। ঘরের সব কাপড় চোপড় বিছানাও কেচে ঝকঝক করে। তারপর ব্রত আরম্ভের দিন সন্ধ্যার সময় স্নান করে রাঁধতে বসে ব্রতী মা। ওইদিন খাওয়ার আবার নানা রকম নিয়ম কানুন আছে। নেনুয়া মানে 'পু(ল বা ধুঁধুল' খেতেই হয় ব্রতীদের। চান করে সবাই সূর্যকে নমস্কার জানিয়ে পিতল বা কাঁসার ঘটিতে করে জল ভরে ঘরে আসে। তারপর ওই ঘটকে ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করে ঘটের গলায় জিতিয়াটা বেধে দেওয়া হয়। জিতিয়া রূপা দিয়ে তৈরি আনেকটা মঙ্গলসূত্রের মতো দেখতে সূতোয় বাধা লকেট। তারপর ঘটের নীচে ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সারা(ণই ওখানে ধূপ বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ওইদিন সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যের সময় আরেকবার স্নান করে ভোগ তৈরি

করতে বসে ব্রতী মায়েরা। যে যেমন পারে পুরি-পীঠে, মালপোওয়া, ীর (মিষ্টান্ন) তৈরি করে। ভাত তরকারীও রাধে। তরকারিতে আবার নেনুয়া, পুই ডাটা দিতে হয়। ভোগ সাজিয়ে পুজো শেষ করে ব্রতী মা তারপর শুধু মিষ্টান্ন খেয়ে উপোস ভাঙে। ওইসময় আবার কোন শব্দ হলে বা কেউ ডেকে দিলে খাওয়া ছেড়ে উঠে যেতে হয়। ওইদিন আবার জাগরণ রাতে ঘুমোয় না কেউ। সব বাড়ির ব্রতীরা একজনের বাড়িতে জড়ো হয়ে গান করে। ভোর রাতে আবার যার যার ঘট নিয়ে সবাই দল বেধে নদীতে যায় চান করতে —

''রাধে (কমিন, দুপুরে বহনিয়া

কি চলিহ ভইলি না রাধে

গঙ্গা আসানপোয়া

সুখী গেলি গঙ্গা

সুখাই গেলি যমুনা

সুখাইও গঙ্গা না.....''

চান করে উঠে ঘটের জল ভাসিয়ে আবার গায় —

'' ভরি গেইলি গঙ্গা

উমরি গেইলি যমুনা

উমরিহ গঙ্গা না....''

তারপর নদীর পাড়ে নিকিয়ে নেনুয়া, (ধুধুল) পাতা সাজিয়ে ওর উপর চিড়া, খই, মিঠাই, পুরি সাজিয়ে ধূপ ধুনো ফুল দিয়ে ভিজে কাপড়ে আবার পুজো করে ব্রতী। তারপর ওই প্রসাদ সবাই শাড়ির আঁচলে একজন আরেকজনকে দেওয়া নেওয়া

করে। তারপর ঘরে এসে ওই প্রসাদ সন্তানকে খাইয়ে জিতিয়াটাও পড়িয়ে দেয় সন্তানের গলায়। এভাবেই সমাপ্তি হয় জিতিয়া ব্রতের। কোনও মা হয়তো তখনও গুণ গুণ করে গায় —

"একমনা করেলা

গঙ্গা নাহায়ে যাইব

একমনা ....."[২৩]

জাওয়া পরব — জাওয়া পরব উদযাপন করা হয় শস্যের কামনায়। ঈ(ের নির্দিষ্ট ধর্ম নয়, কর্মের দ্বারা ফসল ফলছে এবং সেই ফসল প্রাপ্তির আনন্দ নাচ-গান প্রভৃতি ত্রি(য়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। যদিও মেদিনীপুর থেকে পু(লিয়া পর্যন্ত সমস্ত 'মাহাতো' সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই পরব পালন করে। ভাদ্রমাসের শুক্লপ(ের একাদশীর ছয় সাতদিন আগে থেকে মাহাতো সম্প্রদায় এই উৎসব আরম্ভ করে।[২৪]

বনবাসী জনগোষ্ঠীর কিশোর কিশোরীরা যারা এই উৎসবের উদ্যোক্ত(া তারা পুকুর, খাল বা নদী থেকে ছোট ছোট ধামায় ভিজে বালি তুলে আনে। এই বালি ভর্তি ধামাগুলোকে বাড়ির উঠোনে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় উপস্থাপিত করে তার উপর ছড়িয়ে দেয় ৫/৭টি করে ধান, মুগ, ছোলা, অড়হর, জনার, সর্ষে প্রভৃতি শস্য। তারপর একাদশী পর্যন্ত প্রতি সকালে সেগুলোকে হলুদ ও মেথি দ্বারা ভেজানো জলে নিষিক্ত(করে অঙ্কুরিত করে তোলা হয়। যদি প্রচুর পরিমাণে অঙ্কুরোদগম হয় তবে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলবে এই আশা জাগে। জাওয়া শব্দের তাৎপর্যগত অর্থ হল 'জিওন' বা অঙ্কুরিত করে তোলা। জাওয়া পুজোর উপকরণ হল হরিতকি, বেল, ধান, কাকুড়পাতা, কেয়াফুল।[২৫]

জাওয়া উৎসবের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে জাওয়া গীত। ভাদ্রমাসে শস্য বীজ অঙ্কুরিত করার জন্য উৎসব করে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী। কিশোর-কিশোরীরা নাচ ও গানের সহযোগে এই গীতকে পরিবেশন করে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ওই

জাওয়াকে ঘিরে নাচ ও গান চলতে থাকে। [২৬]

ছট পূজা— ছট পূজা শুধু বিহারের লোক উৎসব হিসেবে সবাই জানত কিন্তু আজকাল ছট পূজা বিশেষ সম্প্রদায়ের না থেকে সমগ্র জাতির সার্বিক উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি(সহকারে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগানে ছট পরবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। চা বাগান ছাড়াও ছট পরব এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ছট পরব বিহারের শ্রেষ্ঠ উৎসব। ছট পরব শুধু যে বিহার প্রদেশে সীমাবদ্ধ তা নয়। বিহারবাসীরা যে দেশে আছে ছট পরব সেখানেই উদযাপিত হয়। এদের সঙ্গে যে জাতির উঠা বসা বা ঘনিষ্ঠতা তারাও ছট উৎসব পালন করেন। ছট পরব অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী আর সপ্তমীতে। ষষ্ঠীর দিন অস্তগামী সূর্যকে প্রথম অর্ঘ দিয়ে ব্রতের উপবাস শু(এবং পরের দিন উদীয়মান সূর্যকে দ্বিতীয় অর্ঘদানের পর উপোস ভঙ্গ করা হয়। ছট পরব সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন সূষ্ঠী, কারো মতে ছট 'ছট সইখা'। দুইদিনের ব্রত উৎসব হলেও ছট পরব কোথাও কোথাও চারদিন, কোথাওবা একমাস ধরে চলে।

ছট পরব মূলত সূর্য পূজা, ব্রত বা উপাসনা। মহাভারত থেকে জানা যায় নাগকন্যা, সুকন্যা, দৌপদী এঁরা সূর্যের উপাসনা করে অভীষ্ট ফল পেয়েছিলেন। ব্রতের সময় এঁদেরই কাহিনী পাঠ ও শ্রবণ করা হয়। ব্রতীর উপোসের প্রথমদিন রাতে আর দ্বিতীয় দিন সকালে মুখে জল দেবার আগে সূর্যমণ্ডল, আলপনা করে ধূপদীপ জ্বেলে কুলোয় ডালায় ঝুড়িতে বা কাঁসার স্টীলের বা পিতলের গামলায় প্রসাদ সাজিয়ে কলাগাছ, আদাগাছ, হলুদগাছ, আখের ঝাড়, মুলোর গোছা, ঝুনো নারকেল ও অন্যান্য শাকসবজি নিয়ে ব্রতের আয়োজন করেন। ছট পূজার আসল উদ্দেশ্য সূর্য ষষ্ঠীর ব্রতের মাধ্যমে জগতকে অন্ধকার থেকে আলোয় উদ্ভাসিত করা।[২৮]

আমাদের বরাক উপত্যকায় ছট পূজার সময় বিভিন্ন স্থানে ছট পূজা করতে দেখা যায়। বরাক নদীর তীরে চোখে পড়ে ছট পূজার মনোরম দৃশ্য। বরাক নদী ছাড়া ছোট ছোট জলাশয় বা পুকুর পাড়েও ছট পূজার দৃশ্য চোখে পড়ে। বরাক

উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগানে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্রিশগড় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত চা শ্রমিকরা বসবাস করছে এবং দীর্ঘ দিন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তাই এই উপত্যকার বিভিন্ন বাগানেও ছট পূজার আয়োজন করা হয় খুব ধূমধামের সঙ্গে।

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগানে, বিশেষত, বিহার থেকে আগত লোকেরাই ছট পূজা বা ছট পরব পালন করে থাকে। ছট পূজা বা ছট পরব বলতে গেলে বিহারের আমজনতারই পরব। এই ছট পূজা এক কঠিন ব্রত। আসলে ছট মানে সূর্য পূজা। সূর্যদেবতার আরাধনা। ষষ্ঠ থেকে ষঠ। তা থেকে চলতি কথায় ছট। মানে ষষ্ঠ তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।[২৯]

ছট যেহেতু সূর্য দেবতার পূজা। তাই খুব নিষ্ঠা এবং ধৈর্য সহকারে চারদিন বিভিন্ন কঠিন কঠিন নিয়মের মাধ্যমে ব্রতীরা এই পূজার আয়োজন করে থাকেন।

প্রথম দিন — যদিও ষষ্ঠী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়. তবে ব্রতীকে চতুর্থ তিথিতেই নখ কেটে সাবান দিয়ে স্নান করে ঘরদোর পরিস্কার করে শুদ্ধ হতে হয়। পঞ্চমীতে সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যের পর দরজা বন্ধ করে খুব শুদ্ধভাবে কিছু রান্না করে খেতে হয়।

দ্বিতীয় দিন — এইদিন ব্রতীরা নির্জলা উপবাস থাকে। এদিন সারাদিন তারা কোন কিছু মুখে দিতে পারবে না। বিকেলবেলা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় উপবাস ভাঙা হয় বাড়িতে পূজার মাধ্যমে। তারা ভগবানকে প্রসাদ নিবেদন করে পরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তা বিতরণ করে। [৩০]

তৃতীয় দিন — এদিন ব্রতীরা ফল প্রসারী যোগার ও সবাইকে নিয়ে খুব শুদ্ধভাবে ঠেকুয়া, নানারকম মিষ্টদ্রব্য তৈরি করে। বিকেলবেলা ব্রতীরা নদী বা কোন জলাশয়ের দিকে যায়। সঙ্গে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, পাড়ার সবাই যায়। বাজনা বাজে, বাজি' ফাটানো হয়। কোমর জলে নেমে অস্ত যাওয়া সূর্যকে নানা ফলমূল দিয়ে প্রণাম করে। ওই সময় গায়ত্রী মন্ত্রও জপ করেন ব্রতীরা। ওইদিন ব্রতীরা নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে পূজা করতে যান। বাড়ির বউ থেকে ছেলের বউ তারপর নাতবউ সবাই এই

কঠিন ব্রত পালন করেন। তবে পু(ষরাও এই ব্রত করতে পারে।[৩১]

চতুর্থ দিন — পূজার শেষদিন অর্থাৎ সূর্য উঠার আগে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে নদীর তীরে যায়। সূর্যকে অর্ঘ দেওয়া থাকে তাদের উদ্দেশ্য। ব্রতী নদীতে গিয়ে স্নান করে হাতজোড় করে সূর্যের দিকে ফুল ধূপ জল প্রসাদ দিয়ে সূর্যকে পুজো করে ঘরে ফিরে এসে জল খায় ব্রতী। তারপর পাড়াপড়শীসহ সবাইকে প্রসাদ বিলিয়ে নিজেও কিছু খেয়ে ওই বারের মত ওই কঠিন ব্রতের সমাপ্তি করে। [৩২]

বরাক উপত্যকার ছট পূজা দেখার সাথে সাথে আমি ছত্রিশগড়ে গিয়ে ছট পূজা দেখার সুযোগ পেয়ে যাই। সেখানকার দেওঘরে গিয়ে দেখতে পাই অসমের বাইরের ছট পূজার নিয়মনীতি। তেমন কোন পার্থক্য নেই। আমি ওখানকার দু'একটি ঘাটে পূজো প্রত্য(করেছি। এবং স্থানীয় TV Channel এ ছট পূজার অনুষ্ঠান দেখেছি। প্রত্যেকটি ঘাটে ছট পূজার জন্য ছিল সুবন্দোবস্ত।

ঝুমুর নাচ ও গান — বাগান এলাকার সাংস্কৃতিক জীবনে উৎসবের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাগান সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক চিহ্(ায়ক যদি কিছু থাকে, তা হল 'ঝুমুর'। 'ঝুমুর' পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, পু(লিয়া, মেদিনীপুর, ওড়িশার আদিবাসী অঞ্চলসমূহ, বিহারের সিংভূম, রাচী, হাজারীবাগ, গিরিডি, ধানবাদ, সাওতাল পরগণা, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, সুন্দরগড়, ছত্তিশগড়, বালাঘাট ও রাইপুর জেলার স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রচলিত। ওইসব অঞ্চল থেকে আগত অভিবাসী শ্রমিকেরা ঝুমুরের ঐতিহ্য বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঢোল-মাদলের তালে তালে শ্রমিক ছেলেমেয়েদের নাচ, নাচের শরীরী, আবেদন, গানের বৈচিত্র, এসব মিলিয়ে 'ঝুমুর' চা বাগানে এক সর্বজনীন চেহারা নিয়েছে। সাঁওতাল বা মুণ্ডা শ্রমিকদের আলাদা আলাদা 'ঝুমুর' গান আছে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভূত্ত(বাগান শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটির সন্ধ্যায় একসঙ্গে ঝুমুরে মেতে উঠতে দেখা যায়। [৩৩]

ঝুমুরের উৎস নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন নরনারীর মিলন মূলক রাগিনী 'ঝুমরি' থেকে এসেছে ঝুমুর। আবার কারো মতে প্রাচীন ' ঝোম্বড়াই' এখন পরিচিতি পেয়েছে 'ঝুমুর' বলে। 'জম্ভালিকা' থেকে ঝুমুরের উৎপত্তির কথাও কেউ

বলেন। ঝুমুরের মূল বিষয় রাধাকৃষ(। সীমান্ত বাংলার ঝুমুর গানে বৈষ(ব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে। ঝুমুরের বৈচিত্র ও শ্রেণি বিভাগ উল্লেখ করার মতো। রয়েছে কাঠি নাচের ঝুমুর, দাঁড়শালি ঝুমুর, ঢাড় ঝুমুর, ভাদুরিয়া ঝুমুর। তাছাড়া ছৌ নাচের সঙ্গে ও গাওয়া হয় ঝুমুর।[৩৪]

ঝুমুরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজ জীবনের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান বাগানের কাজের রকমফের, অভিঘাত, শ্রমিকের প্রতিদিনের সুখ, দুঃখ — অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ছবি ফুটে উঠে ঝুমুর গানে। বেশির ভাগ 'ঝুমুর' যৌবনের আনন্দ উজ্জ্বলতার জয়গান। কিছু ঝুমুর গানে বাগিচায় প্রতিদিনের চলমান জীবনের জলছবি ভেসে উঠে। ঝুমুরে নাচ গান, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, হাস্যরস, তামাশা, পরিহাস, আনন্দ উচ্ছলতা সব মিলেমিশে একাকার। ঝুমুর অভিবাসী 'চা' বাগিচার শ্রমিকদের আদিবাসভূমি থেকে আনা সাংস্কৃতিক ঝুলিতে এক উৎকৃষ্ট উপাদান। গুণমান ও জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে কালত্র(মে বাগান সংস্কৃতিতে ঝুমুর' এক অনন্য স্থানের অধিকারী। [৩৫]

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগান পরিদর্শন করে এবং নানাজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, বরাক উপত্যকায়ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাগানে একত্র বসবাস করছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা বিভিন্ন লোকনৃত্যের আয়োজন করে থাকে তাদের পূজা পার্বণের সময়। এরফলে তাদের অবসন্ন মনের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়। সারাদিন রোদ বৃষ্টিতে বাগানে কাজ করে দিনের শেষে বিনা দ্বিধায় তারা এসব পূজা পার্বণের আয়োজন করে থাকে। তারা যে লোকনৃত্যের মাধ্যমে দুঃখকে ভুলিয়ে আপন মনে নেচে যায় সেটা হল 'ঝুমুর নৃত্য'। বিশেষ করে ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত জিতিয়া করম পূজার সময় ঝুমুর নাচের মহড়া সাজায় শ্রমিকেরা।

ঝুমুর শব্দের অর্থ হল 'ঝু' মানে হলো পরিবেশ আর 'মুর' মানে হল গোলাকার হয়ে একত্র লাইন করে কোনকিছু করা। বলা যায় যে একত্র হয়ে গোলাকারভাবে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা নাচই হল 'ঝুমুর'। বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং মাদ্রাস থেকে আসা শ্রমিকরা ভাদ্রমাসে করম পূজা পালন করে থাকে। করম পূজার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল ঝুমুর গান এবং ঝুমুর নাচ। সাধারণত কমবয়সী যুবতী এবং মহিলারা এই ঝুমুর নাচে অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যুবকরাও সমানভাবে

এই নাচে অংশগ্রহণ করে। এখানে বলা যায় যে অল্প বয়সী যুবক যুবতী শুধু নয় পু(ষ এবং মহিলাদের জন্যও ঝুমুর নাচের গু(ত্ব অনেক বেশি।[৩৬] ড্রাম, মাদল, বাঁশী ছাড়াও আরও অনেক ছোটবড় বাদ্যযন্ত্র ঝুমুর নাচের সময় ব্যবহার করা হয়। ড্রামের উপর আঘাতের মাধ্যমেই শু(হয় সমবেত এই নাচ। তারপর একে অপরের কোমর ধরে বৃত্তাকার হয়ে মেয়েরা নাচ শু(করে। নাচের তালে তালে গান চলতেই থাকে। দেবী সরস্বতীর বন্দনার মাধ্যমে ঝুমুর গানের সূচনা হয়। ঝুমুর গানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এই গানে তাদের জীবনের নানা দিক উঠে আসে। শ্রীকৃষে(র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েও তারা গান রচনা করে থাকেন।[৩৭]

ঝুমুর নাচের কোন নির্দিষ্ট পোশাক না থাকলেও দেখা যায় যে যারা নাচে অংশগ্রহণ করে সবাই লালপাড় সাদা শাড়ি পরিধান করে। পায়ে এবং গলায় লাগায় বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কার। সাধারণত তাঁদের খোপায় লাল ফুল লাগানো থাকে। বেশির ভাগ ঝুমুর গানই হয় চার লাইনের। চার লাইন ছাড়াও অনেক বড় বড় ঝুমুর গানও হয়।[৩৮]

ঝুমুর গানগুলি বেশির ভাগই আনুষ্ঠানিক। মেলা, পরব, সামাজিক গার্হস্থ্য ব্রত ও অনুষ্ঠানে এগুলি গাওয়া হয়। ঝুমুরের আসল পরিচয় তার গায়কীতে সুর ও তালের স্বতন্ত্রে। ঝুমুর গানে মুখ্য অংশ প্রেমভাবকে অবলম্বন করে। কিন্তু সেই প্রেম একান্তই গ্রামীণ, অমার্জিত এবং স্পষ্ট বক্ত(ব্যে ঋজু। নাগরিক মনের সূক্ষ্ম ভাবানুভুতি যেমন নেই, তার প্রকাশেও তেমনই অমার্জিত এবং অলজ্জ স্থূল কামনা বাসনা ও ছলাকলা এর মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে।[৩৯]

ঝুমুর দ(িণ পশ্চিম বাংলার পরম্পরাগত গীতিধারা। আদিম যুগে কৃষির সূচনা থেকেই এর যাত্রা শু(বলতে বাধা নেই। আদিম সমাজে কৃষিতে শ্রমগীতি রূপে এর উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছিল। তখন তা খণ্ড ছিন্ন সাময়িক ব্যাপার ছিল। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই ধারা নিজস্ব পরম্পরা গঠন করেছিল। এখন এতদঞ্চলের সবরকম আনুষ্ঠানিক গানে ঝুমুরের ভাবরীতি অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এইসব গানের মধ্যে ভাদু-টুসু-করম, জাওয়া, বাঁধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলি প্রথমে কৃষি সংস্কারে উর্বরতাশক্তি(র ব্রত উপল(ে মেয়েলি গীতিরূপে ঝুমুর আঙ্গিকেই বিকাশ

লাভ করেছে।

'শাগ তুলতে গেছিলি মীনা, তুললি লতাপাতা

কি শাগ তুললি মীনা বুড়ার সঙ্গে দেখা।

ও মীনা মরে যা মরে যা লো

এমন সুন্দর মীনার বর হইল বুড়া।[৪০]

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগানে যাত্রাগানের প্রভাব — কমবেশি দেড়শ বছরের কালসীমায় বাগান সংস্কৃতিতে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রে(িতে 'যাত্রাগান' এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বাধীনতার আগেই বরাক উপত্যকার গ্রাম-শহরে যাত্রাপালার চল থাকলেও চা বাগানে তখন তার প্রসার হয়েছিল কিনা বলা যায় না। বাগানে সাধারণত নাচঘরেই যাত্রাগানের আসর বসে। আবার কোন কোন বাগানে খোলা মাঠে প্যাণ্ডেল তৈরি করেও যাত্রার আয়োজন করা হয়।

আসন্ন দুর্গাপূজার মরশুমকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বরের শু(তেই চা বাগানে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হয়। কখন কখন দুই বা ততোধিক বাগানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাত্রাদল তৈরি হতে দেখা গেছে। আবার কোন কোন (েত্রে আশপাশের বস্তী বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র থেকে লোকজনদের সহায়তায় যাত্রাদল গড়ে উঠে। অধিকাংশ যাত্রাদল গঠনের প্রাণকেন্দ্রে থাকেন বাগানের বাবু। প্রতিবৎসর আগস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে এক অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়।[৪১]

চা বাগানের সমাজ ত্র(মশ বিবর্তনধর্মী হওয়ার ফলে অনেক লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যেতে চলেছে। এমনই একটি প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি হল যাত্রাগান। যাত্রাগান এখানে কোন এক সম্প্রদায়ের না থেকে সবার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। সব সম্প্রদায়ের মানুষ যাত্রাগানের আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। একদা চা বাগানে যাত্রাগান পরবের আকার ধারণ করেছিল। আগে বিশেষ করে যাত্রাগানের একটা রমরমা ভাব ছিল।

কিন্তু ইদানিংকালে ডিশ এন্টিনা এবং টিভি চ্যানেলের বহুল প্রচলনে চা বাগান সমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি যাত্রার প্রতি মানুষের মোহ কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকার অনেক চা বাগান আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে প্রায় বনধের দোরগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। চা শ্রমিক ও স্টাফরা যেখানে (জি (টির জন্য চিন্তামগ্ন সেখানে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিশেষত ব্যয়বহুল যাত্রাদল গঠন করে অভিনয় করা সহজ নয়।

চা বাগানের কর্মময় জীবনের টানোপোড়েন তৎকালীন সময়ে যাত্রাগান বিনোদনের অংশ ছিল, চা শ্রমিক তথা চা বাগানে কর্মরত কেরানীদের সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের মধ্যে হৃদয়ের মিল ছিল অনেক বেশি। ভালোবাসার একটা বাতাবরণ তৈরি হতো এই সংস্কৃতির মাধ্যমে একে অপরের প্রতি থাকতো সহানুভূতিশীলতা যা হয়তো আজ দেখা যায় না।

একদা এ অঞ্চলে যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করেন চরম জনপ্রিয়তা ও সুনামের সাথে লালবাজারের শ্রীকৃষ(অপেরা, দেওয়ান চা বাগানের শঙ্কর অপেরা, পানিভরার কমল অপেরা, ঝাপিরবন্দের কাঁচাকান্তি মা অপেরা, লারসিংপারের নবজ্যোতি অপেরা, উধারবন্দের ইন্দ্রজিত অপেরা, রংপুরের মুক্তি(অপেরা, ভাগাবাজারের সতীশ অপেরা, বৈঠাখালের গণেশ অপেরা, কারিছড়ার নবীন নাট্য সংঘ, শিলচরের পুলিশ নাট্য সংঘ, বাণ্ডু চা বাগানের নবীন সংঘ, শালগঙ্গার প্রদীপ সংঘ অপেরা, কাটিগড়ার অ(ণোদয় অপেরা, বদরপুরের নীলমণি অপেরা, চন্দ্রনাথপুরের স্বস্তি অপেরা, শিলচরের শিল্পি মহল, লালার মিলন সংঘ, বেকিরপারের নবত(ণ অপেরা, কাটাখালের নবনাট্য সংস্থা, শিলচরের ত্রিবেণী নাট্য সংস্থা, বদরপুর, কালাইন ও পালোরবন্দ চা বাগানের যাত্রাদল প্রমুখ।[৪২]

যে কোন কারণেই হোক গত দশ পনেরো বছর যাবৎ বাগানে আর যাত্রাগান তেমন জমছে না। শহরাঞ্চলে এই পরিবর্তন আরো আগেই ল(্য করা গেছে। বাগান অঞ্চলে সেই যাত্রাপাগল বাবুরা হয় কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন নয়তো প্রয়াত। বেশকিছু প্রতিভাবান শ্রমিক অভিনেতা বাগানের বাইরেও অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে যাত্রাসংগঠক তৈরি হয়নি। নানা কারণে যাত্রার সেই অমোঘ

আকর্ষণ আজ আর নেই। যে সমস্ত বিষয় ও আঙ্গিকের যাত্রাপালা বাগান অঞ্চলে অভিনীত হয়েছে, ওই গুলোর সাংগঠনিক প্রত্রি(য়া বি(-ষণ করলে একথা বলার প্রয়োজন হয় না যে চা বাগান সংস্কৃতিতে যাত্রার প্রচলন ও প্রসার চারপাশের বৃহৎ বঙ্গ সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিস্তারের ফসল।[৪৩]

আদিবাসী শ্রমিকরা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগানে বহুদিন যাবৎ বসবাস করে আসছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগানে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের জীবন চলছে গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যদিয়ে। ইচ্ছাসত্বেও সময়াভাবে তারা তাদের আদিম রীতিনীতি ঠিকভাবে পালন করতে পারছে না। বাগানে মালিকপ(ের মর্জির উপর নির্ভর তাদের জীবন। মালিকপ(ের বি(দ্ধে গিয়ে ওদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানিংকালে ছেলে মেয়েরা আধুনিকতার দিকে ঝুকছে, মোবাইল এবং টিভির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বড়সিঙ্গা বাগানের ৭০ বছরের বয়সী ঝাউরা মুণ্ডা। বড়সিঙ্গা বাগানের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি(হিসেবে পরিচিত ঝাউরা মুণ্ডা এবং শনিচড়া মুণ্ডার কাছ থেকেই আমি বাগানে কর্মরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মনোভাবটা ভীষণভাবে পরিল(িত। সমাজের বিভিন্ন ধরণের পূজাপার্বণ, বিবাহ, সন্তানজন্ম প্রভৃতি মাঙ্গলিক আচার ও অনুষ্ঠান, মৃত্যুজনিত অশৌচ ও পারলৌকিক কৃতাদির (েত্রে সমাজের নিয়মনীতি মেনেই সবকিছু করতে হয়। তাদের মতে বিবাহ হলো একটা সামাজিক দায়। এই দায় উদ্ধারে সমাজের মানুষ পরস্পর পস্পরকে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করে থাকে। সমবেত নৃত্যগীত ও ঘরে প্রস্তুত মদ পান করা তাদের সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য।

চা বাগানে এসে তাদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের আংশিক পরিবর্তন ঘটেছে। এবং সামাজিক পরিবেশও অনেকটা পাল্টে গেছে। বসবাসের জন্য কোন নির্দিষ্ট কৌম বা গোষ্ঠীভিত্তিক বাসগৃহ চা বাগানে নেই,পৃথক জীবিকারও বন্দোবস্ত নেই। একটি লাইন বা মহল্লায় চ্ছুত-অচ্ছুত ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে বসবাস করতে হয়। জল, চিকিৎসা, শি(া ও জীবিকা সবই বারোয়ারি তালিকা ভুক্ত(।[৪৪]

বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন বাগানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আদিবাসীরাও বসবাস করছে। দু-একটি বাগান ছাড়া প্রায় সব বাগানেই মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সামাজিক নিয়মনীতি একই। এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে লেখিকা কাজল দেমতা বলেন যে, প্রত্যেক বছর মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বাগান থেকে আগত মুণ্ডারা এক বাগানে এই সভার আয়োজন করে থাকেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আদিবাসী মুণ্ডারা আদিম নিয়মনীতি বর্জন করবেন না। পূর্ব পু(ষদের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করেই তারা চলতে চান।[৪৫]

আদিবাসীদের মধ্যে সমাজই শাস্ত্র, শাস্ত্রই সমাজ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি যে কোনও (ে ত্রেই সমাজের অনুমোদন ও সমাজ শাসনই শাস্ত্রবাক্য। ভূতপ্রেত নজইর গুজইর অপদেবতা, মৃতপিতৃপু(ষের আত্মা, গাছ পাথর মাটি দেবতা সূর্যদেবতা ইত্যাদিতে তারা বি(্বাসী। রোগ সারাতে ওরা ওষুধ থেকে জড়িবুটি বা ঝাড়ফুককেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বড়সিঙ্গা বাগানের ঝাউড়া মুণ্ডা এবং শনিচড়া মুণ্ডার সঙ্গে আলাপের পর এদের বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিবাহনীতি সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য পেয়েছি তা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

মুণ্ডা সন্তানের জন্ম — মুণ্ডা সমাজে সন্তান জন্মের নয় দিনের দিন নরতা বা সূতিকা সম্পন্ন করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ দশম দিবসে গ্রামের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের উপস্থিতিতে নামকরণ করা হয়। নামকরণ শুভ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য সাকিন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। জাতিকরণ অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত মুণ্ডা সন্তান মুণ্ডা হয় না। কানফুটো করার মধ্য দিয়ে এই জাতিকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। কানফুটো করার দিন সকালবেলায় স্বজাতীয়দের মধ্যে কেউ এসে নবজাতকের কান বিদ্ধ করবে। এদের বলে কান বিধানিয়া। কান বিধানোর সময় পুত্র সন্তানের (ে ত্রে লাগে মোরগ ও কন্যার (ে ত্রে মুরগী আর পিঠে ও ধান।[৪৬]

কান বিধানোর নিয়ম — প্রথমে উঠোনের মধ্যে গোবর নিকানো একটি জায়গায় খানিকটা ধান বিছিয়ে তার উপর একটি কাঠের পিড়ি রাখা হয়। ওই পিড়ির উপর

সন্তানকে বসিয়ে কান বিধানো হয়। সে সময়ে আমন্ত্রিতদের মধ্যে কুলোয় করে একরাশ পিঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যে যতটা পারে কুড়িয়ে নেয়। তারপর মোরগ বা মুরগিটি নিয়ে আমন্ত্রিতদের চারধারে ঘুরে ঘুরে আছাড় মারা হয় এবং পরিশেষে ওই মোরগ বা মুরগির মাংস রান্না করে সবাইকে খাওয়ানো হয়। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীরাই আমন্ত্রিত হয়। এরপর গু(জনদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। গ্রামের মেয়েরা বিশেষত বউরা আসার সময় ঝুড়িতে করে সাধ্যমত ধান ও শিশিতে কিছু সর্ষের তেল নিয়ে আসে। যেখানে পিড়িটি পাতা থাকে সেখানে সেই পিড়ির উপর ধান ছড়িয়ে তারা সন্তানের মাথায় তেল মাখিয়ে দেয়। সেই আশীর্বাদী ধানগুলি সন্তানের নামে জমা করে রাখা হয়। এরপর খাওয়া দাওয়া এবং নাচ গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।[৪৭]

মুণ্ডা সমাজের বিবাহ — মুণ্ডা সমাজে সমগোত্রে বিবাহ হয় না। সমাজের বেশির ভাগ পাত্রপাত্রীর বিবাহ সম্পর্কে তাদের অভিভাবকরাই ঠিক করে থাকেন। প্রথমে পাত্রপ(কনে দেখার পর মোটামুটি পছন্দ হলে ওদের ভাষায়, 'খাপখাইলে' পাত্রীপ(কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারপর উভয় প(ই একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পাত্র-পাত্রীর গুণাগুণ, শুভ-অশুভ বিচার করে। এখানে কিছুটা অন্ধবি(্বাসের আভাস পাওয়া যায়। পাত্রপাত্রী নির্বাচনের নিয়মটি হলো — পাত্রপ(সমাজের চার পাচজন মানুষ নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার পথে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে কোনকিছু শব্দ বা পাখির ডাক যদি শুনতে পায় তাহলে সেটাকে অশুভ বলে চিহ্নি(ত করা হয়। বিশেষ করে ওই সময়টাতে শিয়ালের ডাককে অশুভ বলে তাদের বি(্বাস। পাত্র নির্বাচনেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।[৪৮]

আদিবাসী সমাজে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের কোন ভূমিকা নেই। তবে পাত্রপাত্রী নির্বাচনে বা সম্বন্ধ ঠিক করতে 'আগুয়া' (ঘটক) এর ভূমিকা আছে। 'সিয়া সগুন' মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বিয়ের একটি প্রধান অঙ্গ। সিয়া সগুন হল পাত্রের বাড়ি থেকে বেজোড় সংখ্যক মানুষ পাত্রীর বাড়িতে যায় পাত্রীর হাতের জল খাওয়ার জন্য।

মুণ্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহের দিন(ণ ঠিক করে তাদের সুবিধা বুঝে। তবে পাত্রপাত্রীর জন্ম তারিখ, শনিবার এবং সোমবার বাদ দিয়ে বিবাহের তারিখ

ঠিক করা হয়। পাত্রপাত্রী নির্বাচন হয়ে গেলে যে অনুষ্ঠান হয় তাহলো তিলক (মঙ্গ লাচরণ)। তিলকের নিয়ম হল পাত্রপ(মেয়ের বাড়িতে পৌছার পর একটি ধানকাটা কাস্তের মধ্যে কাপড় জড়িয়ে শস্যের তেলে ডুবিয়ে তার মধ্যে আগুন জ্বেলে আলো করে ঘটক দেখাবে পাত্রী। তিলকের সময় উভয়প(ের মামার মধ্যে পাশা খেলারও একটি রীতি আছে। তারপর উভয়প(ের সামনে একটি কাসার থালায় পাত্রপ(ের তরফ থেকে সাধ্যমত টাকা দেওয়া হয় পাত্রীকে। [৪৯]

বিবাহের প্রথম দিন সকালে উপোস থেকে মাড়োয়া নির্মাণ করা হয়। মাড়োয়া নির্মাণ করে জামাইর ছোটভাই। আম, জা(ল, ভেলোয়া, মহুয়াসহ পাঁচটি বৃ(ের ডাল দিয়ে উঠোনের এক কোণে পরিস্কার করে লেপে তারপর মাড়োয়া বানানো হয়। তাছাড়া মাড়োয়া বানানোর আরও উপকরণ হল তীর, ধনুক, লাঙ্গল, জোয়াল, চাটা বাতি। তারপর পূজা করার সময় একটা লাল মুরগীর প্রয়োজন হয়।

মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে নকল যুদ্ধাভিনয় প্রথাটা ভীষণভাবে প্রচলিত। বরযাত্রীর আসার পর তীর ধনুক নিয়ে পাত্রীপ(সামনে আসলে নকল যুদ্ধাভিনয় চলতে থাকে। ইচ্ছা করে কন্যার প(হেরে যাওয়ার পর পাত্রপ(ভিতরে প্রবেশ করে। বরপ(আসার পর সবার পা ধুয়ে দেয় পাত্রীপ(ের মেয়েরা। পা ধুওয়া মুণ্ডা সম্প্রদায়ের একটি আদি প্রথা। এই প্রথার কোন হেরফের হয়নি। এখনও এই প্রথাটি তারা অনুসরণ করে চলছে। মুণ্ডা সমাজে কুঞ্জের ভেতরে বিয়ের কোন অনুষ্ঠান নেই। কিন্তু বর্তমানে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে একে অপরের রীতিনীতিকে গ্রহণ করছে। ফলে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা দু-তিনটি পরিবার তাদের পুরনো প্রথাকে ভেঙে নতুন কিছু করতে চেয়েছিল। এরফল ভোগ করতে হয় তাদেরকে। বড়সিঙ্গা বাগানেই এমন হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ঝাউড়া মুণ্ডা। ফলে পরিবারটিকে মুণ্ডা সম্প্রদায় থেকে বহিস্কার করা হয়। তিনি আরও বলেন যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথাটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।[৫০]

প্রথম দিনে মাড়োয়া বানানোর পর দ্বিতীয় দিনে বিয়ে করতে যাওয়ার পর কন্যা বাড়িতে বর কন্যাকে স্নান করানোর একটা নিয়ম আছে। বরকে স্নান করানোর পর বরের বাড়ি থেকে এক কলস জল নিয়ে কনের বাড়ির এক কলস জলের সঙ্গে

মিশিয়ে নানাধরণের মেয়েলি আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের স্নান করানো হয়। স্নান করানোর সময় যেসব উপকরণগুলি প্রয়োজন, তাহলো শিল, নোড়া, সাড়াই পাতা, তামা, হলুদ স্নানের পর বর কনেকে সিদূর লাগিয়ে দেয়। এই 'সিন্ধা দান' প্রথাটি অবিবাহিত বা বিধবাদের দেখা নিষেধ।

সূর্য দেবতাকে সা(ী রেখে বা প্রণাম করে একটা মেয়ের নূতন জীবনের চলার পথ শু(হয়। সিন্ধা দান হওয়ার পর বরপ(কন্যাকে আর কন্যাপ(বরকে নিয়ে যায়। সেখানে হাসি-তামাশা সহযোগে পরবর্তী অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়। মার শাড়ি, শালা ধূতি এবং নানী শাড়ি তিনটি বস্ত্র বরকে নিয়ে যেতে হয়। বিয়ের পর কন্যা বিদায়ের সময় সমাজের মুখিয়া একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদায়ের সময় গান গাওয়া হয়। বিয়ের দিন দানের পর খাওয়া দাওয়ার পর বিদায় হয়।[৫১]

বরের বাড়িতে আসার একদিন পর কিছু মেয়েলি অনুষ্ঠান করা হয়। যেমন পাকস্পর্শ হল নতূন বউ ওইদিন রান্না করবে এবং সবাইকে পরিবেশন করবে। ওইদিন একটা ভোজপর্বেরও আয়োজন করা হয়। পরের দিন কোনও অসুবিধা না থাকলে ফিরাযাত্রায় যায় বর নতুন বিবাহিতা কনেকে নিয়ে। বৃহস্পতিবার বা শনিবার থাকলে ফিরাযাত্রায় যাওয়া নিষেধ।

মুণ্ডা সমাজে যেহেতু একগোত্রে বিবাহ হয় না। তাই কেউ যদি একগোত্রের বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন মেয়েকে বিয়ে করে তখন সমাজ তাদেরকে মেনে নেয় না। এরজন্য বলিদান দিতে হয় মেয়েটিকে। স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার পরও মুণ্ডা সমাজে স্থান পায় না। ছেলেটির সমাজে সর্বত্র আসা যাওয়ার কোন বাধা থাকে না। ওদের সন্তানকেও অনেক সময় সমাজে তোলা হয় নিকন্তু মেয়েটিকে ওর ভালোবাসার দাম মেটাতে হয়। অনেক সময় আবার দেখা যায় যদি মেয়েটি সমাজে তোলার যোগ্য হয় তাহলে দীর্ঘদিন পর 'সিদূর' দান করে ছোট একটি অনুষ্ঠান করে সমাজে তোলা হয়।[৫২]

মুণ্ডা সমাজের পূজা পার্বণ — মুণ্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক ধরণের পূজা পার্বণ পালন করে থাকেন। একসময় মুণ্ডা সমাজে করম পূজা খুব নিষ্ঠাসহকারে পালিত

হত। মুণ্ডাদের মধ্যেও দুর্গাপূজা এখন মুখ্য পূজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈশাখ মাসে ওরা পালন করে থাকে 'থা(ল' পূজা। ভাদ্রমাসে নতুন মোড়ালি ধান কাটার সময় ওদের মধ্যে একটা পূজা হয়ে থাকে। ওই পূজা না করে বয়স্করা যারা বিবাহিত, নতুন চালের ভাত খায় না। বাইরে কোথাও গেলে নতুন চালের ভাত না খেলে ওদেরকে পুরনো চালের ভাত বানিয়ে দেওয়া হয়। ওই পূজাতে একটা কারছি মুরগির প্রয়োজন হয় সঙ্গে পুইশাক এবং কচু শাকও লাগে। নতুন চালের ভাত রান্না করে বুড়াবুড়িকে দিয়ে তারপর সবাই খায়।

মুণ্ডা সমাজে শুধু মেয়েদের মধ্যে অনেক ব্রতের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রথম ধান লাগানোর সময় মেয়েরা স্নান করে ভিজা কাপড়ে এই অনুষ্ঠান করে থাকেন। ধান লাগানো জমির মধ্যে একটি জায়গা পরিস্কার করে ওই পূজা করা হয়। কালাই, চাউল, সিদূর, মোমবাতি, ধূপকাঠি দিয়ে পূজা করে নতুন ধান লাগানো হয়। এই নতুন ধান লাগানোর 'বাঙারি' বলা হয়। [৫৩]

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষরাও রোগ চিকিৎসায় ওঝা, গুনীন, ঝাড়ফুক তথা অপদেবতার ভূমিকায় বি(্বাস করে এবং জড়িবুটি দেশিয় গাছ গাছড়ার শিকড়, ছাল, বীজ, ফল পাতা ইত্যাদি প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য আদিবাসী চা শ্রমিকের মত মুণ্ডারা পূর্বপু(ষদের আত্মা, গাছ, পাহাড়, মাটি ইত্যাদি পুজো করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের অন্ধবি(্বাসও এদের মধ্যে প্রচলিত।

মুণ্ডাদের খাদ্যাভাস রন্ধন প্রণালী — খাসী, পাঁঠা, ছাগল, ময়ূর, গো-সাপ, ইদূর, শুকড়, হরিণ, (কাক-চিল, শকুনী, গুধিনী) ইত্যাদি বাদে নানা জাতীয় পাখির মাংস সবরকমের মাছ ও শুকনো মাছ, হাঁস, মুরগি ও পাখির ডিম, খরপোশ সজা(ইত্যাদির মাংস আমিষ খাদ্য হিসেবে মুণ্ডাদের খাদ্যাভাসের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে নিরামিষ আহারের মধ্যে ডাল, তরকারী, শাকসবজি, শিমূলকোন্দা, গাছ আলু, বুনো আলু, চিড়ে, মুড়ি, খই, (টি, আটা ময়দা, বাজরা, জোয়ার গ্রহণ করে থাকে। খাবারের উপযুক্ত(সবধরণের ফল, টক জাতীয় তেতুল, আমড়া, আমলকী ইত্যাদি এবং চালের গুড়ের ভেতর ডাল মিষ্টি নুন দিয়ে তৈরি একপ্রকার পিঠে তাদের

প্রিয় খাবার। মসুর কলাই অড়হর খেসারি মুগ, বুট ইত্যাদি যা সহজভাবে পাওয়া যায় সবই তাদের আহারের তালিকায় থাকে। মশলার মধ্যে প্রায় সবধরণের মশলা রন্ধনপ্রণালীতে মুণ্ডারা ব্যবহার করে থাকে। বাঙালিদের মতো সাতলানোর প্রথা ওদের মধ্যে নেই। [৫৪] উল্লেখ্য যে বর্তমানে আধুনিকতার ছোয়ায় ওদের জীবন ধারণ এবং বন্ধনপ্রণালীতেও নানারকম পরিবর্তন ল(্য করা যায়।

মুণ্ডাদের সাজপোশাক — পু(ষদের লেংটি ও পাগড়িই আদি পোশাক। কিন্তু বর্তমানে বাঙালিদের সংস্পর্শে এসে মুণ্ডাদের পোশাক পরিচ্ছদে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ বর্তমান। বাঙালিদের মতো ধূতি, জামা, প্যান্ট, সার্ট, এখন তাদের পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের পড়তে হয় নিজ হাতে বোনা বারো হাত লালপড়ে শাড়ি। এখনতো সবাই মিলের তৈরি শাড়িই পরিধান করে।

গহনার মধ্যে রূপোর বালা, হাঁসুলী, রূপো ও পাথরের মালা, কানে বড় বড় রূপোর মাকড়ি, নাকে বড় রূপোর নথ, খোপা বন্ধনী, আংটি , পায়েল, মল ও তাগা। ফটো তোলা এখনও তাদের মধ্যে খুব বেশি প্রচলিত নয়। মেয়েদের সাজপোশাকের মধ্যেও এখন অনেক পরিবর্তন ল(্যনীয়।

সাঁওতাল জাতি — সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবতঃ 'শাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ এবং এই নামটি তাঁরা এদেশে কয়েক পু(ষ ধরে বসবাস করার পর গ্রহণ করেছেন। আগে প্রাচীন মেদিনীপুরের এক অংশকে বলা হত সাওন্ত বা সামন্ত ভূমি। সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে। সামান্তপাল মানে সীমান্তর(ক। মধ্যযুগে এই সামান্তপাল কথাটিই সামন্ত আঁল ও পরে সাঁওতাল, পরে সাঁওতালে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে দুটি জাতির বাস ছিল। একটি আর্য জাতি ও অন্যটি দ্রাবিড় জাতি। এই দ্রাবিড় জাতি থেকেই বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। স্থান কাল ভেদেও জাতির নামকরণ করা হয়েছে। অনেকের ধারণা এই অস্ট্রিক শ্রেণির একটা গোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে পু(লিয়া জেলার সাতসিকার অঞ্চলে বসবাস করে। সাতসিকার কথা থেকে সাঁওতাল কথার উৎপত্তি। সাঁওতাল কথা থেকে সাঁওতাল

জাতি।[৫৫]

প্রাচীন প্রথানুসারে সাঁওতালরা গোষ্ঠীগতভাবে নিজেদের মধ্য থেকে মুখিয়া বা মাঝি নির্বাচিত করে থাকে। চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশে যাযাবরী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সাঁওতালরা একা থাকে না। দল বেঁধে নতুন জায়গায় গ্রামের পত্তন করে। গ্রামপত্তন, গৃহনির্মাণ, সীমানা স্থিরকরণ, পূজাস্থান নির্মাণ এবং গ্রামদেবতা প্রতিষ্ঠার পর একদিন মাঝির আহ্বানে গ্রামের সব লোক এসে জড় হয় তার আঙ্গিনায়। মাঝি প্রথমে তাদের বুঝিয়ে দেবে গ্রামের সবাইকে কী কী সামাজিক নিয়মকানুন আচার বিচার মেনে চলতে হবে।

তারপর সে অধীনস্থ কর্মচারী মনোনীত করবে গ্রামের শাসন শৃঙ্খলা র(ার জন্য। মাঝি সবার উপরে। মাঝির পর পারাণিক । পারাণিকের কাজ হল মাঝির সব কাজে সাহায্য করা। মাঝি গ্রামে না থাকলে পারাণিক মাঝির কাজ করবে। মাঝি গ্রাম থেকে পালিয়ে গেলে, কিংবা তার মৃত্যু হলে, তার যদি কোন পুত্র বা ভাই না থাকে, তবে পারাণিকই মাঝি হবে। [৫৬]

ইংরেজদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সাঁওতালরা প্রথমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানের কাজে নিয়োজিত হয়। এর পেছনে হয়তো লোভ, ভয়, ভীতি প্রদর্শন, ইংরেজদের কার্যপদ্ধতি থাকতে পারে। এর ফলে চা বাগান অঞ্চলে সাঁওতাল বসতি গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে অসমের বরাক উপত্যকা সহ বিভিন্ন জেলায় চা এর প্রসার ঘটতে থাকে। অন্যান্য চা জনজাতিদের মতো আসামের বিভিন্ন বাগানেও সাঁওতালরা কাজ করে যাচ্ছে। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগানেও সাঁওতাল চা শ্রমিকদের দেখা যায়। বড়সিঙ্গ া বাগানের ফাঁড়ি বাগান চান্দখিরাতে গিয়ে দেখতে পেলাম সাঁওতালদের বসতি। ওই এলাকাতে শুধু সাঁওতাল চা শ্রমিকদের বসবাস। সাঁওতালদের বিভিন্ন পূজাপার্বণ, লোকাচার, বিবাহ নিয়মনীতি জানতে হাজির হয়ে গেলাম সাঁওতাল বস্তীতে। সঙ্গে গেলেন কাজল দেমতা। অনেকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ওদের জীবন ধারণ প্রণালী, ওদের রীতিনীতি এবং আরো নানা তথ্য। ওরা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে আমাদেরকে। পু(ষদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মেয়েলোকও এসে হাজির হন তখন। মেয়েরাও সমানভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

হিন্দু সাঁওতালদের নামকরণ অনুষ্ঠান — জন্মের পর সন্তান পিতার গোত্র বা বংশ পরিচয়ে চিহ্নি(ত হয়। সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন রীতি অনুয়ায়ী কোন গ্রামে সন্তান জন্ম হলে গোটা গ্রামটিকে অপবিত্র গণ্য করা হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং অশৌচ কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত পূজার্চনা স্থগিত থাকে। যে পরিবারে ছেলে বা মেয়ে জন্মায়, সেই পরিবারকেও অশৌচ পালন করতে হয় এবং অশৌচ থাকাকালীন কেউ সে বাড়ির অন্ন গ্রহণ করে না।

এখনে উল্লেখ করা যায় যে, চা বাগানে পাশাপাশি অবস্থান করার দ(ণ জাতিভেদে পৃথকবসতির কোন ব্যবস্থা নেই। সবজাতের লোককে মিলেমিশে একসঙ্গে বসবাস করতে হয় তাই আমরা বলতে পারি গ্রাম অশৌচ পালনের কোন প্রয়োজন এখন আর হয় না। তবে সং(-ষ্ট পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনরা অশৌচ পালন করে থাকেন। চা বাগানে বসবাস করার ফলে প্রাচীন ও আদিম নিয়ম বা সংস্কারগুলি (ীয়মান হলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। ওদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম যে, প্রাচীন রীতিনীতিকে বজায় রাখতে ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

প্রাচীন রীতি অনুসারে পুত্র সন্তান জন্মালে পাঁচদিন এবং কন্যাসন্তানের (ে ত্রে তিনদিনের দিন নখ, চুল, কামানো হয়। নপ্তার দিন সন্তানের পিতা স্বজাতীয় সমস্ত গরিব ছেলেদের নিজ আবাসে আমন্ত্রণ করে আনবেন। আমন্ত্রিতরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করবে নাপ্তি হিসেবে। নাপ্তি প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করবে মূল পুরোহিতকে। তারপর একে একে ছোট পু(ত, মাঝি বা বড় মোড়ল, জগমাঝি বা ছোট মোড়ল ইত্যাদিকে এবং গ্রাম বা লাইনের অন্য সকলকে এবং সবশেষে ছেলের পিতাকে। সকলের নপ্তা হয়ে গেলে ধাত্রী বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দুটো পাতার বাটি সহ দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে। একটি বাটিতে থাকবে জল। নাপ্তি শিশুর চুল কামিয়ে অন্য একটি বাটিতে তা স্থাপন করবে ধাইয়ের হাত দিয়ে।[৫৭]

সাঁওতাল চা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, ওদের মধ্যে নামকরণের একটা চিরাচরিত প্রথা ছিল। এবং এখনও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। ওরা সবসময়ই চেষ্টা করে নিজের আদিম রীতি নীতিকে টিকিয়ে রাখতে। প্রথম পুত্র জন্মালে ঠাকুর্দার নামে এবং প্রথম কন্যাই মায়ের মায়ের নাম পাবে।

তার পরবর্তী সন্তানেরা যথাত্র(মে কাকা-কাকীমা, মামা-মামীমার নাম পাবে। নামকরণের পর ধাইবুড়ি সবার সামনে এসে সেই নাম ঘোষণা করবে। তারপর পাতার বাটিতে নিমভাত নিয়ে উপস্থিত সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ জীবাণু প্রতিরোধক নিম পরিবেশন করে অশৌচ মুক্ত(হবে এবং সন্তানকে সমাজ বা জাতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবে।[৫৮]

সাঁওতালরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের বাধা নিষেধ (Taboo) মেনে চলে এবং গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক (Totem)কে শ্রদ্ধা করে। বিভিন্ন গোত্রের নাম ও ধর্মীয় প্রতীক নীচে দেওয়া হল —

গোত্রের নাম	**ধর্মীয় প্রতীক**
১। হাঁসদা	হাঁস
২। কিসকু —	শঙ্খচিল
৩। মুর্মু	নীলগাই
৪। মাণ্ডি	খেরদা নামক ঘাস
৫। হেমব্রম	সুপারি
৬। সরেন	সপ্তর্ষি
৭। বাস্কে	পান্তাভাত
৮। বেসরা	বাজপাখি
৯। চঁড়ে	গিরগিটি
১০। পাউরিয়া	পায়রা

গোত্রগুলি আবার উপগোত্রে বিভক্ত। উপগোত্রকে সাঁওতালিতে 'খুট' বলা হয়। খুট পরিবারের পরিচিতি তুলে ধরে। এজন্য খুট অভিন্ন হলে তাঁরা রক্তের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করে।[৫৯]

সাঁওতালরা বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এগারো গোত্রের লোকজন দেখা যায়। বেদেয়া গোত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। একসময় বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন কৌলিক বৃত্তি ছিল বলে জানা যায়। যখন সরেন গোত্রের লোকেরা সৈনিকের কাজ করতেন, সে জন্য তাঁদের বলা হত সরেন সিপাহি। কিস্কু গোত্রের লোকেরা রাজপাট চালাতেন। তাই তাঁদের বলা হত কিস্কু রাপাজ। মাণ্ডি গোত্রের লোকেরা কৃষি কাজ করতেন। তাঁই তাদের ডাকা হত মাণ্ডি কিসাঁড় বা কিপিসাঁড়। মুরমু গোত্রের লোকেরা পুরোহিতের কাজ করতেন বলে তাদের 'মুরসু' ঠাকুর বলা হত। হেমব্রমরা দেওয়ানের কাজ করতেন। বাস্কে গোত্রের লোকেরা বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করতেন। হাঁসদা এবং টুডু গোত্রের লোকেরা লোহার জিনিসপত্র তৈরি করতেন এবং উৎসবে নাকাড়া — মাদল বাজাতেন।[৬০] এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে এ ধরণের আলাদা আলাদা কর্মভিত্তিক সমাজ তাদের মধ্যে আর দেখা যায় না। চা বাগানে কাজ করার দরুণ ওদের এখন একটাই পরিচিতি তা হলো চা শ্রমিক।

সাঁওতালদের বিভিন্ন পূজা পার্বণ —

অন্যান্য আদিবাসী চা শ্রমিকদের মত সাঁওতালদের মধ্যেও নানা ধরণের পূজা পার্বণ প্রচলিত। চা বাগানে এসে অনেক ধরণের পূজাপার্বণের জন্য সময় না মিললেও বিশেষ কতকগুলো পূজা ওরা এখনও নিয়মনীতি মেনেই করে আসছে। এমনই একটি পূজা বা উৎসব হল বাহা পরব।

বাহাপরব (Flower festival) বসন্তের আগমনে যখন সমস্ত পৃথিবী ফুলে ফুলে ভরে উঠে, পশু পাখিরাও উল্লাসে মেতে উঠে। সাঁওতালরা উৎসবের ভেতর দিয়ে প্রকৃতি দেবীকে পূজা করেন। বাহা সাঁওতালদের অতি পবিত্র ধর্মীয় উৎসব। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে 'বাহা' উৎসব আরম্ভ হয়। বাহা পর্ব পালন না করা পর্যন্ত সাঁওতালরা মহুয়া ফল খায় না। মেয়েরাও শালফুল পরে না।

বিশেষভাবে, শালগাছের উদ্দেশ্যে তাদের এই উৎসব পালন করেন। প্রথম দিন স্নান, দ্বিতীয় দিন পূজার অর্ঘ দান।

উৎসব প্রাক্কালে পূজা আরম্ভ হয়। প্রথমে মহুয়ার নির্মাল্য দান করা হয়। উৎসবের অনেক প্রত্রি(য়া ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। শৌখিন ও ঐ(র্যে ভরপুর সাঁওতাল পু(ষ রমণী এই উৎসবের জন্য অধীর আগ্রহে অপে(া করে বসন্ত আগমনীর জন্য। দরিদ্র সাঁওতাল জাতি ভুলে যায় তাদের দরিদ্রতা। জমি চাষের ক্লান্তিতেও এদের ভেতর আসে প্রাণের সজীবতা। তাঁরা মেতে উঠেন আনন্দ হইহুল্লোড়ে। অপে(া করেন বসন্তকালে শালের মঞ্জরী গাছে যখন দেখা দেবে। শালফুল গাছে ফুটলে নব বসন্তের দামামা মনের মধ্যে বেজে উঠে। মেয়েরা খোঁপায় পরে শালফুল, ছেলেরা কানে দোলায় সেই ফুল। বেজে উঠে মাদলের বোল। খাটো, আটোসাটো কাপড়ের বেষ্টনীতে মেয়েরা হয় সজ্জিতা। লালপেড়ে শাড়ি এদের হাসির ঝলক আনে। মাদলের তালে হাত ধরাধরি করে ছন্দোময় নৃত্যের তালে নেচে উঠেন সাঁওতাল রমনীগণ। নৃত্যের আঙ্গিনায় পু(ষ কয়জনে বাজিয়ে চলেন মাদল ও বাঁশের বাঁশি। দর্শক হয় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। সঙ্গে চলে হাড়িয়া মদ ইত্যাদি। সে এক অনবদ্য প্রাণের ফোয়ারা, যা সবাইকে করে বিমোহিত।[৬১]

সাঁওতালদের আদি দেবতা হলেন ঠাকুর। তারপর দেশান্তরের মধ্য দিয়ে নানান পূজার প্রচলন হয়েছে সাঁওতাল সমাজে। তাদের মতে ঠাকুরকে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঠাকুর সবাইকে দেখতে পান। তিনি স্বয়ং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তার ইচ্ছাতেই জগত চলছে। সিঙ্গাবঙ্গা হলেন মহান সূর্য দেবতা। অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে আছেন ডমেসিম বঙ্গা, রামসালগি বা জাহের এরা, মাঝি হাড়ামবঙ্গা, এবং আরো অনেক দেবতাদের ওরা মান্য করে থাকেন।

সাঁওতালদের নবান্নপূজা — ভাদ্রমাসে ধান পাকার সময় এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। নায়কে সকালে স্নান সেরে যার জমিতে ধান পেকেছে, তার জমিতে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যতটা ধান কাটতে পারবে কাটবে। তারপর সেগুলো জাহেরে এনে গোবর দিয়ে শুদ্ধ করে পরপর জাহের-এরা, মড়েঁকো, মারাংবু(, গোসাই এরা, পরগণাবঙ্গাকে নিবেদন করবে সামনে রেখে।[৬২]

সোহরায় পরব — সাঁওতালদের সোহরায়ই পূজা আসলে হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজা। ওরা একে বলে থাকেন (েতের মাতা। পৌষমাসে ধান কাটা ও ঝাড়াই হয়ে গেলে নতুন ফসলের জন্য দেবতাদের পুজো করা হয় ও আত্মীয় কুটুমদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়। ধনী গরিব সবাই এই উৎসব করে। সোহরায় উৎসবের কোনো নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই। গ্রামের মাঝি বৈঠক ডেকে সবার মত নিয়ে উৎসবের দিন ধার্য করে। ঘরে ঘরে হাড়িয়া বানানো শু(হয়ে যায়। আত্মীয়কুটুমদের নিমন্ত্রিত করা হয়। চান্দখিরা বাগানের সুখদেব হেমব্রম জানান যে এই পূজা ঘরের বাইরে হয় এবং পু(ষরাই প্রধানত এই পূজার সব কাজ করে থাকে। এই পূজাতে হাড়িয়া, চাউলের গুড়া, ডিম ইত্যাদি উপকরণ প্রয়োজন হয়। [৬৩]

সাঁওতালদের বিবাহ — সাঁওতাল সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা নেই। ছেলেমেয়ে উপযুক্ত(হলে পিতা মাতাই পাত্র পাত্রী মনোনীত করেন। পাত্রী মনোনয়নে বংশ পরিচয় এবং তাঁর মা মাসীরা পরিশ্রমী কিনা এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। স্বগোত্রে তাদের বিবাহ সম্বন্ধ হয় না। সমাজে দেবর বরণ এবং শালী বিবাহ প্রচলিত। কিন্তু বড় ভাই কখনো ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন না। [৬৪]

সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহ অনেক ধরণের হয়। আর্থিক সঙ্গতি ও পরিবারের অবস্থার উপর তাদের বিবাহরীতি নির্ভরশীল। বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করার ব্যাপারে ঘটকের ভূমিকা খুব গু(ত্বপূর্ণ। তাদের ভাষায় ঘটককে বলা হয় 'রায়বার'। স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা চালিয়ে পাত্রপাত্রীর অনুসন্ধান করে আর আপসে কথাবার্তা চালিয়ে একধরণের বিবাহ হয়। এই বিবাহে সমাজের মানুষই সব ঠিক করবে। পাত্রপাত্রী দেখতে যাওয়ারও একটা নিয়ম আছে। আগে রাতের অন্ধকারে যাওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়ম বদলে গেছে। এখন ওরা দিনের বেলাতেই যে কোন সময় যায় পাত্র পাত্রী দেখতে। ছেলে দেখতে আসলে মদ, মাছ, মাংস আনবে এবং সবাইকে খাওয়ানো হবে। পাত্রী পছন্দ কিংবা অপছন্দ না হলেও সাঁওতালদের রেওয়াজ মতে প্রণামী হিসেবে ৫০০ টাকা দিতে হবে। [৬৫]

যারা খুব গরিব এবং ঘটা করে বিবাহ সম্পন্ন করার (মতা যাদের নেই, তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান কনে বাড়িতে হয় না। গরিব মা বাবার মেয়েটিকে তুলে এনে ছেলের বাড়িতেই সব অনুষ্ঠান করা হয়। বিবাহে ঢাক ঢোল তেমনভাবে ব্যবহার হয় না। [৬৬]

পাকা দেখাদেখি অর্থাৎ পাত্রপাত্রী নির্বাচন হয়ে গেলে তিলক (মঙ্গলাচরণের) মাধ্যমেই শু(হয় বিয়ের অনুষ্ঠান বা নিয়ম নীতি। ওদের মধ্যেও গেট ধরাধরি প্রথাটা ল(্য করা যয়। মুণ্ডাদের মত সাঁওতালদের মধ্যেও পা ধোওয়ানো বিপুলভাবে প্রচলিত। গেটে ঢুকবার আগে জামাইকে পা ধুয়ে দেওয়া হয়। কন্যার বোনেরা নানা রকম হাসি তামাশা করে।

পাত্রপ(ের বাড়িতে মাড়োয়া বানানো হয়। মাড়োয়া বানানোর জন্য প্রয়োজন হয় লাঙ্গলের ঈশ, বেতপাতা, কিশমিশপাতা (বর্তমানে পাওয়া যয় না বলে লাগে না) বাদাম গাছের ডাল বা পাতা। মাড়োয়া'র সামনে থেকে পাত্র যায় বিয়ে করতে।

সাঁওতালদের মধ্যে 'আম্বা' বিয়ার প্রচলন আছে। আম্বা বিয়ার মানে হল আমগাছের সঙ্গে বিবাহ। বিয়ের দিন ছেলেকে একটা অবিবাহিত আমগাছের নীচে নিয়ে যাওয়া যায়। অবিবাহিত আমগাছ বলতে বুঝায় একটা আমগাছের সঙ্গে শুধু একজনেরই বিবাহ হবে। সমাজের প্রধানব্যক্তি(বিবাহের আচার নির্দেশ করবেন। আমগাছে আগে সুতো বাধা হবে, ধুনো দেওয়া হবে, কাপড়ও দেওয়া হয়। তারপর ঐ আমগাছের সঙ্গে ছেলেকে সাতপাক ঘোরানো হবে। ওদের কাছ থেকে জানা যায় যে, অনেক সময় আমগাছের অভাবের কারণে, আমগাছের ডাল লাগিয়ে সেটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এতে ফলের প্রাপ্তি তেমন হয় না। অর্থাৎ বিবাহিতদের সন্তানপ্রাপ্তি হয় না বা দু'একটি হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে আমগাছে যেহেতু ফলের সংখ্যা বেশি তাই ওই গাছকেই ওরা বেছে নিয়েছে। (সুখদেব হেমব্রম আমাদেরকে দেখান, ওনার বাড়ির আশে পাশের প্রায় সব আম গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে।)

সাঁওতালদের মধ্যে স্নান, সিদূর দান, ছেলের বাড়িতে চতুর্থমঙ্গল, ফিরাযাত্রা ইত্যাদি আরো অনেক প্রথা প্রচলিত। মেয়ের বাড়িতেও মাড়োয়া বানানো হয়। সেই মাড়োয়ার নীচে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মা-বিষ(ু-মহে(েরকে সা(ী রেখে পাত্র সিদূর পড়ায় পাত্রীকে। কন্যাকে বড় একটা ঢুলিতে বসিয়ে আনা হয় বিবাহস্থলে। ওদের বিবাহের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন রকমের গান আর বিভিন্ন রকমের হাঁড়িয়া পরিবেশিত হতে থাকে।[৬৭] পাত্রপ(অর্থাৎ বরযাত্রী আসার পর বরকে দেখে ঠাট্টা করে কন্যাপ(ের

মেয়েরা গান করে —

"আমপাতাই গোটা গোটা, তেতুলপাতাই ফাঁটা,

এইসান দুলহাই আলক, হায়রে মেছা-দাড়ি পাকা।'

(সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকদের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ২১৮)

ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালোবাসা হওয়ার পর মেয়েটি বিবাহের প্রস্তাব দিলে, ছেলে কিংবা ছেলের অভিভাবকেরা যদি বিবাহের আপত্তি করে তাহলে মেয়েটি গ্রামের জগমাঝিকে সমস্ত কথা জানায় এবং ঘর সংসার করার জন্য জোর করে ছেলের বাড়িতে প্রবেশ করে। কিছুদিন অত্যাচার সহ্য করে থাকতে পারলে, জগমাঝি পরবর্তী সময়ে গ্রামের লোকদের ডেকে বধূ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে। এই সমস্ত বিবাহকে 'ত্রিওর বল বাপলা' বলে।[৬৮]

'ইতুৎ' হচ্ছে একরকম জবরদস্তিমূলক বিবাহ। ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভাব ভালবাসা হওয়ার পর মেয়ে কিংবা মেয়ের অভিভাবকরা যদি বিবাহে আপত্তি করে তাহলে ছেলে একদিন সুযোগ বুঝে জোর করে মেয়েটির সিঁথিতে সিদূর লাগিয়ে দেয়। সাঁওতাল সমাজে কোন মেয়ের সিঁথিতে কোনো ছেলে যদি সিদূর কিংবা সামান্য ধুলোও লাগিয়ে দেয় তাহলে সমাজের বিধান অনুযায়ী মেয়েটিকে ছেলেটির স্ত্রী ধরা হয়। সাঁওতালদের বি(াস কোনো মেয়ের সিঁথিতে মাত্র একবারই একটি ছেলে সিদূর দিতে পারে এবং তার অধিকারে থাকে। মেয়েটি যদি কোন কারণবশত ঘর না করে কিংবা ছেলেটি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তার আর কুমারী মেয়ের মতো বিবাহ হয় না। কেউ যদি তাকে বিবাহ করে তবে সিথিতে সিদূর দেবে না।

যাই হোক জোর করে কোনো সাঁওতাল মেয়ের সিথিতে সিদূর দিলে পরে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে ছেলেটি তালাক দিলে মেয়েটি 'ছাড়ুই' হিসেবে গণ্য হবে। তার আর কুমারী মেয়ের মতো বিবাহ হবে না। তাকে সাঙ্গা বিবাহের দলে ভিড়তে হবে নতুবা কলঙ্কিত অপবাদ নিয়ে দিন যাপন করতে হবে। ছাড়ুই,

মেয়েদের সমাজে মর্যাদা নেই। [৬৯]

এখানে উল্লেখ্য যে সাঁওতালরা ওদের জন্মভিটে ছেড়ে বরাকের বাগানে এসে কাজ করছে। ফলে ওদের পূজা পার্বণ বা বিবাহ রীতিনীতিতে তেমন কোনও পার্থক্য পরিলি(ত নয়। আদি-রীতিকেই ওরা এখনও বজায় রাখার চেষ্টায় রত। সময়াভাবে হয়তো এতে একটু আধটু পরিবর্তন ল(্য করা যায়।

সাঁওতালদের নাচ গান — সাঁওতাল সমাজে নাচ গান বি(্বাস প্র(্বাসের মতো। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো তাদের জীবনের বিভিন্ন পূজা পার্বণ গুলো নাচ গানে ভরপুর। নাচ গানের মধ্যে যেন ওরা প্রাণ খুঁজে পায়। সারাদিনের খাটুনির পর নাচ গানের আয়োজন ওদের মধ্যে নতুন আমেজ এনে দেয়। এককালে অরণ্যে শিকার, মাছ ধরা, হাড়িয়া-মদ্যপান, বুড়ো বুড়িদের কাছে গল্প শোনা, হেঁয়ালি শোনা, এসবই ওদের আমোদ প্রমোদের একটা অঙ্গ ছিল। কিন্তু বর্তমানে চা বাগানের জীবনের শিকার ও মাছ ধরার প্রসঙ্গটাই নেই। তাছাড়া অরণ্যে রয়েছে অনেক বিধি নিষেধ। তাছাড়া একটি বাগানে সাঁওতাল শ্রমিকও থাকে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার। তাই এখন ওদের জীবনে নাচগান ও মদ্যপান এবং সেই সঙ্গে সিনেমা, ভিডিও, হাটে যাওয়া আমোদ প্রমোদের মধ্যে পড়ে। নাচ ও গানের সঙ্গে নাগারা, মাদল আর বাঁশি এবং একতারা বাজানো হয়। এছাড়া রয়েছে শিঙা।

ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধা বছরের যে কোনো সময়েই মনের ইচ্ছানুয়ায়ী একটি নাচের অবতারণা করেন। তাকে লাগাড়ে নাচ বলে। কালীপূজার সময় যে নাচ দিয়ে আমোদ ভরপুর করেন নিজেদেরকে তাকে সহরাই নাচ বলে।

দাঁসাই নাচ শুধু পু(ষদের (ে ত্রে প্রযোজ্য। এই নাচে মেয়েরা অংশ নিতে পারে না। সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের অনেক উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। [৭০]

সাঁওতাল সমাজে কুসংস্কারের প্রভাব এখনও আছে কিনা জানতে চাইলে বড়সিঙ্গা বাগানের সুখদেব হেমব্রম জানান যে, ওরা এখনও ওই বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনি। সাঁওতাল সমাজে কুসংস্কার, অপদেবতা, ভূতপ্রেত, মন্ত্রটন্ত্র,

ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে এখনো ওরা বি(্বাসী। অধিকাংশ সাঁওতাল জাতিই অশি(িত। অসুখ হলে প্রথমে এরা ঝাড়ফুঁকে রোগ সারানোর উপায় খোঁজেন। রোগ কঠিন হলে গুনিন বা ওঝার শরণাপন্ন হয়ে বিপন্ন হলে শেষ মুহূর্তে হয়তো ডাক্ত(ার বা কবিরাজদের নিকট যান।

চা বাগানে ওঝার ওপর নির্ভরতা অনেকটা কমে গেলেও এখনও ডাইন, অপদেবতায় বি(্বাস, শেকড় গেড়ে আছে সাঁওতাল সমাজে। তাই মাঝে মাঝে 'ডাইন' হত্যার খবর পাওয়া যায়। অশি(া কুশি(া এবং সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের চত্র(ান্তে এখনও তারা কুসংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ।

মন্ত্রটন্ত্র, ঝাড়ফুকের পাশাপাশি জড়িবুটিও দেশীয় গাছগাছড়ার ছালমূল পাতা দিয়ে প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসা প্রণালী এখনও শুধু সাঁওতাল নয় প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। তাদের বি(্বাস যে ডাইনীদের জন্যই পরিবারের নানান অমঙ্গল যেমন অপরের সঙ্গে শত্রুতা, আত্মীয় বিচ্ছেদ, পিতাপুত্র বিরোধ, ভ্রাতৃবিরোধ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ খুন জখম ইত্যাদি হয়ে থাকে।

সমগ্র চা শ্রমিকদের মিলন (েত্র ঃ বরমবাবার মেলা —

বরাক উপত্যকার প্রায় প্রতিটি চা বাগানের মানুষ একত্র সমবেত হয় কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বরমবাবার মেলা উপল(্যে। শিলকুড়িস্থিত বরমবাবার মন্দিরে ওইসব হাজার হাজার পূর্ণার্থী এবং সাধু সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। বরমবাবার মেলা চা জনজাতিদের জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনদিনব্যাপী চলিত মেলায় বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চা জনজাতিরা আসে নানা আশা-আকাঙ(া নিয়ে। এই বরমবাবার মেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা লৌকিকতা লোককথা উপকথা। মেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। মেলার ইতিহাস এবং বরমবাবার মাহাত্ম্য জানার জন্য মন্দিরের প্রধান পূজারী সূর্যদেও তেওয়ারির সঙ্গে সা(াৎ করলে তিনি বরমবাবার মাহাত্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

বরমবাবা ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলিতে

কাজ করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চা শ্রমিকরা আসেন। ভারতের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পঃবঙ্গ থেকে দলে দলে লোক আসে বরাক উপত্যকায়। উত্তরপ্রদেশের একদল সাধারণ লোকের সাথে পিতার সঙ্গে এসেছিলেন এই ব্রাহ্মণ সন্তান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭ থেকে ৮ বছর। তিনি ব্রহ্মগায়ত্রী সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চা শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশের অমানবিক অত্যাচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজ বিরোধিতা করায় ইংরেজরা অল্পবয়সী বালককে অবহেলা করলে তিনি বটবৃ(র নীচে স্বয়ং সমাধিস্থ হন। [৭১]

শিলকুড়ি মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৮৬০ সালে, সেসময় চা বাগানের ইংরেজ মালিক, ম্যানেজাররা শ্রমিকদের দাসের মতো ব্যবহার করত। অত্যাচার আর নিপীড়নে চা শ্রমিকদের জীবন ছিল জর্জরিত। লংটুরাম (বরমবাবার ছোট বেলার নাম) এসব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বাগানের ম্যানেজার এবং মালিকের সঙ্গে সরাসরি দেখা করেন। কিন্তু ফল হয় উল্টো। তিনি অপদস্ত এবং অপমানিত হয়ে, অপমান সহ্য করতে না পেরে (বর্তমান বরমবাবার ধামে) শিলকুড়ি রাস্তার পাশে এক বিশাল বট বৃ(র নীচে স্বেচ্ছায় সমাধিস্থ হন। এখবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে চা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বাগানসহ অন্যান্য এলাকায় নানান অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। এখনও দেখা যায় গভীর রাতে হঠাৎ চা বাগানের ফ্যাক্টরীর মেশিন চলতে শু(করেছে আবার কখনও হয়তো কাজ করা অবস্থায় চা বাগানের মেশিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও এলাকার বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এসব ঘটনা থেকে ইংরেজ মালিক ও ম্যানেজাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন।[৭২]

লংটুরাম ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন এবং বয়স অতি অল্প থাকায় তাকে বলা হয় লংটুরাম। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ, পরবর্তী যুগ ও কালের বিবর্তনে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মণ শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে 'বরম' এ পরিণত হয়। তখন তাঁর পরিচিতি দাঁড়ায় 'লংটুরাম বরম' বাবা বা বাবাজী বলে সম্বোধিত করা হত। তাই স্বাভাবিকভাবে লংটুরাম বরম এবং বাবাজী শব্দ যোগ হয়ে উচ্চারণ করতে করতে সং(প্ত রূপে চলে আসে বরম বাবা নামে। এখন এই নামেই শ্রদ্ধালুরা তাঁকে স্মরণ করেন। পুজো করেন। কিন্তু মূল মন্দিরে পুরো নামটিই লংটুরাম (ব্রাহ্মণ) বরমবাবা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। [৭৩]।

গোড়ার দিকে শিলকুড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ বিশেষ করে হিন্দি ভাষীরা কার্তিক মাস ব্যাপী সকালে স্নানাদি সেরে ঘরেই পুজো করতেন। অনেকে আবার বরমবাবা ধামে এসেও পুজো করতেন। মাসের শেষে কার্তিক পূর্ণিমার সময় বরম বাবার ধামে এসে সত্যনারায়ণ কথা পাঠ, প্রবচন, পুজো, যজ্ঞাদি কীর্তন ইত্যাদি করার কাজ শু(হয়। ধীরে ধীরে সারাদিন ব্যাপী এই পুজো অর্চনাদি চলতে থাকে। জনসমাগম বৃদ্ধি হতে থাকে। ব্যবসায়ীরা দোকান পাঠ নিয়ে হাজির হন। তারপর ধীরে ধীরে কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে বরমবাবার ধামে মেলার সূচনা হয়। সেই মেলাই আজ বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থীর আগমন ঘটে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের সমাগম হয়। তাতেই বোঝা যায় বরমবাবার মেলার মাহাত্ম্য অপরিসীম। মন্দিরের পূজারী আরও বলেন — আজও ওই এলাকার বৃহদাংশ ভক্ত(নিজের পরিবারের শুভকর্ম, বিবাহানুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি করার সময় বরমবাবার আর্শীবাদ পাওয়ার আশায় পুজো দেন। নববিবাহিত দম্পতির সুখী জীবন কামনায় বরমবাবার আশীর্বাদের জন্য মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বরমবাবার আশীর্বাদ নিয়ে নূতন বর বধূ নূতন জীবনের পথে চলা শু(করেন। এই উপত্যকার অনেক ধর্মপ্রাণ নরনারী নিজের মঙ্গলকামনায়, আরোগ্য কামনায় কোনো কার্যসিদ্ধি অথবা সংকটমোচনে বরমবাবার 'মানস' করেন এবং পুজো দেন। তিনি আরও বলেন, অনেকে 'মানস' এর পুজো, যজ্ঞ, কীর্তন, সত্যনারায়ণ কথা প্রবচন কোনো ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে দিয়ে করিয়ে বরমবাবার আশীর্বাদ কামনা করেন। [৭৪]

এই ধামে যে বটগাছের নীচে বরমবাবা স্বেচ্ছায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেই বটগাছের ডালপালা বড় হতে হতে রাস্তায় নেমে পড়ে, ফলে যানবাহন সহ যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু কেউ ডালপালা ছাটাই করার সাহস পায়নি। তাই সবাই মিলে 'মানস' করলে বরমবাবাকে পাঁচ কিলো নাড়ুর ভোগ দিয়ে শান্ত করে ডাল পালা কাটা হবে। কিন্তু এরমধ্যে জনৈক পুরোহিতকে 'বরমবাবা' স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে জানালেন পাঁচ কিলো নাড়ুর ভোগে চলবে না, সাথে মহাবিষ(যজ্ঞ করতে হবে। অবশেষে মহাবিষ(যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু স্থানাভাবে ধামের পেছনে ফাঁকা জায়গায় যজ্ঞাদির আয়োজন করা হয়। তখন কিন্তু যজ্ঞাদির অগ্নি মন্থন করে জ্বালানো হত, নানা প্রচেষ্টার ফলেও অগ্নিদেবতা প্রকট হলেন না। তখন জনৈক পুরোহিতের কানে যেন ভেসে আসে আমার পেছনে অগ্নি মন্থন কেন? সম্মুখে করতে হবে। বাবার সম্মুখে

অগ্নি প্রজ্বলিত করে যজ্ঞ অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করা হয়। প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাপক জনসমাগম হয়। নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯৪২ সালে সিলকুড়ি বাগানের তদানীন্তন ম্যানেজার ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যেহেতু এই ধামটি শিলকুড়ি চা বাগানের তাই এই কমিটিতে বাগানের প্রাধান্য বেশী ছিল। এই কমিটির সভাপতি পদটি বাগান ম্যানেজার পদাধিকার বলে অলঙ্কৃত করেন। সাধারণ সম্পাদক কোষাধ্য(নির্বাচিত হন বাগানের বড়বাবু। সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এলাকাবাসী থেকে। [৭৫]

১৯৪২ এরপর ১৯৬১ সালে বেনারস থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিত সহযোগে ধামের যাত্রীশালা মণ্ডপে শতচণ্ডীর অনুষ্ঠান ৯ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রতিবছর চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজার আয়োজন হয়। ১৯৯৪ সালে ধামে শ্রী শ্রী দুর্গা মূর্তি স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে জ্যোতিষীর মতে অষ্টগ্রহের একত্রিত মিলনে অঘটনের সম্ভাবনার নিবৃত্তির জন্য মহাবিষ(যজ্ঞের জন্য এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে বেনারস থেকে সাতজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং এই উপত্যকা থেকে পয়ত্রিশজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বিশেষভাবে আমন্ত্রিত করা হয় এবং তারা উপস্থিত হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রায় নয়দিন ব্যাপী এই যজ্ঞে হাজার হাজার ভক্ত(প্রাণ নরনারী উপস্থিত ছিলেন। [৭৬]

শুধু চা জনজাতি, হিন্দিভাষী নয় সমস্ত ভাষার ধর্মপ্রাণ নরনারী এখানে বরমবাবার আশীর্বাদ পেতে উপস্থিত হন। অনেকে তাদের মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় বা পূরণ করতে এদিন পুজো দেন। পূর্ণিমার আগের গভীর রাত থেকে স্নানাদি সেরে হাজার হাজার ভক্তে(র লম্বা লাইন পড়ে যায়। বরমবাবাসহ অন্যান্য দেবতাদের জল, দুধ, সমর্পণ করতে দেখা যায়। এখনও মেলা শু(হয় চতুদর্শী থেকেই। পূর্ণিমা তিথিতে ভীড় উপচে পড়ে। যদিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বরমবাবার মেলায় ভক্ত(দের দেখা যায়। কিন্তু প্রত্য(করা যায় যে বিশেষ করে চা বাগানের শ্রমিকরা প্রতিবছর মেলায় উপস্থিত হন। প্রতিবছর দেখা যায়, বিশেষ করে মেলার ওই তিনদিন শিলচর থেকে যাওয়া গাড়িগুলোতে বিভিন্ন প্রান্তের চা বাগানের শ্রমিকদের বরমবাবার মেলাতে যাওয়ার দৃশ্য। প্রতি বছর মেলাতে না আসলে ওদের জীবনে যেন অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

চা শ্রমিকদের সাদরী ভাষা —

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানে পাশাপাশি বসবাস করছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। চা বাগানে একত্র বসবাস করার ফলে তাদের সবকিছুর মধ্যে মিশ্র ভাব পরিলি(ত হয়। তাদের ভাষার মধ্যে সেই প্রভাব বিদ্যমান। চা শ্রমিকদের জীবনযাপনে মিশ্রতার সবথেকে বড় নিদর্শন হল ওদের সাদরী ভাষা। সব ভাষাগোষ্ঠীর মিলিত ভাষা হিসেবে জন্ম নেয় সাদরী ভাষা। এখন প্রত্যেক বাগানের চা শ্রমিকরা তাদের মিশ্রিত ভাষা 'সাদরী' ভাষাতেই কথা বলতে অভ্যস্ত।

চা শ্রমিকদের কথ্য ভাষার ইতিহাস জানতে হলে শ্রমিকদের অসমে আগমন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অসমে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ করে ১৮৩৯ সালে। চা বাগান পত্তন করার জন্য ইংরেজর সাহেবরা আড়কাঠিয়া বা দালালদের দ্বারা নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে আসতে থাকেন রাঁচি, বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে। পেটের তাগিদে এরা আসেন। রেলগাড়িতে এবং লড়িতে পশুর মত গাদাগাদি করে চাপিয়ে অমানুষিকভাবে এদেরকে আনার সময় পথেই বহু লোকের মৃত্যু হতো। দুঃখ বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেও অনেকের আশা ছিল চা গাছ ঝাকড়িয়ে টাকা উপার্জন করে আবার স্ব-ভূমিতে ফিরে যাওয়ার । কিন্তু কোনদিনই দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ৭৭

ঝাড়খণ্ডী আদিবাসী বা অন্যান্য জাতি উপজাতির লোক অসমের জাতীয় জীবনের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছেন মিশ্রিত ভাষা সংস্কৃতি আর সমাজ পদ্ধতির দ্বারা। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভিল, বাউরি, কর্মকার, মাহালি সহ আরো অনেক জাতি উপজাতি লোকদের প্রত্যেকের নিজের নিজের ভাষা, পরম্পরা, জীবনপ্রণালী, পৃথক পৃথক হলেও প্রত্যেকের পারস্পরিক ভাব ও ভাষা আদান প্রদানে চেষ্টারই সৃষ্টি হয়েছিল 'সাদরী' ও বর্ধমানী' ভাষা।

ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, ভারতে এখন যেসব বংশের ভাষা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অস্ট্রিক বংশই হলো ভারতে আগত প্রাচীনতম বংশ। অস্ট্রিক বংশজাতদের মধ্যে মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, খে রিয়া, হো, ভূমিজ, কোল এরা আছেন। এই বংশের

ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কারণ আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল ভাষাভাষি জনসাধারণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সাঁওতালি ভাষা বিহার, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। এই ভাষা এখন নিজস্ব লিপি 'অলচিকি' তে লিখিত হয়। অস্ট্রিক বংশের ভাষার প্রভাব বাংলায় সবচেয়ে বেশি। বাংলায় আগত অস্ট্রিক শব্দের নিদর্শন খোকা-খুকি, খড়-খুড়ি, ঢেকি, ঢিল, ঢিবি, ঝিঙ্গা, চিংড়ি, মুড়কি এগুলো।

অসমের প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই অসমীয়া বা বাংলা-ভাষা সাহিত্য, কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আর নির্ভরশীল হয়ে আছে। ফলে আদিবাসীরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া সংস্কৃতি আর বরাক উপত্যকার সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে পড়েছে স্বাভাবিকভাবে।[৭৭]

'সাদরি' ভাষার উদ্ভব অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বা উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে হয়নি। ছোটনাগপুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন আগেই বাঙালি ভোজপুরী ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় মানুষের সংস্পর্শে আসে। বোধহয় এসব জাতির ভাষা ও ছোটনাগপুরের কথ্য গ্রামীণ ভাষার সংমিশ্রণে এ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। 'সাদরী' ভাষা, বাঙালি বিহারী কারোর কাছেই খুব একটা কঠিন ভাষা নয়। এভাষায় ভোজপুরী শব্দ ও ভোজপুরী ভাষার মিল আছে। 'সাদরী' সহজ বলেই ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও চা বাগানের বাঙালি বাবুরা সহজে রপ্ত করতে পেরেছিল।

অসমে প্রায় দেড়শ বছর আগে চা শ্রমিকরা এসেছিল। তারা সবাই এক ভাষাভাষি ছিল না, ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন সংস্কৃতির লোক ছিল। আবার সব জাতির বাষা ও সংস্কৃতিতে অনেকরকম ফারাক ছিল। মুণ্ডারা মুণ্ডারী ভাষায় কথা বলত, ওরাও যে ভাষায় কথা বলতো ওটার নাম ছিল 'কুড়ুক', সাঁওতালরা সাওতালী ভাষায় কথা বলত। বিভিন্ন উপজাতি একসঙ্গে থাকার দ(ণ কিছু কিছু সাংস্কৃতিক আদান প্রদান স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে ঘটে যায়। চা বাগানের এই ভাষা তাই চা বাগানগুলিতে প্রসার লাভ করতে পেরেছে এবং তাদের সকলের কাছে সমানভাবে গৃহীত হতে পেরেছে। চা বাগানের বাইরে এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি বিশেষ কেউ। তার প্রধান কারণ হয়তো ইংরেজ চা কররা বাণিজ্যের জন্য শ্রমিকদের বাইরে বের হতে দিত না(সারাদিন কাজের মধ্যে আটকে রাখত আর রাতে ঢালাও হারিয়া পানের জন্য ওরা

কোথাও বের হতে পারত না।

যাই হোক, আগের থেকে ভাষাটার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক নূতন নূতন শব্দ প্রয়োগ হচ্ছে। শি(িত শ্রেণির লোক ইংরেজি ও হিন্দি ব্যবহার করছেন বেশি।

উপভাষার আদর্শ ভাষার মিল এমনিতেই কম থাকে। 'সাদরিতে শব্দের ভাণ্ডার কম। যেমন চাটু শব্দের অর্থে চামচ, হাতা, খুন্তি সবটাকেই বোঝানো হয়। 'চেরাই' বলতে যে কোন ধরনের পাখিকেই বোঝায়। 'ডাহার' গাছের ডালকে বোঝায়। আবার পথকেও বোঝায়। এরকম আরো শব্দ আছে যেমন সাঁঝ, বাস, পছ, বাদরি ইত্যাদি। 'সাদরী' ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ তুলে ধরা হল —

ডিংলা — মিস্টি কুমড়া

পিপা — পেপে

কাঠার — কাঁঠাল

থাড়িয়া — থালা

ডোভা — বাটি

আনুয়া — এমনি, নিজে জন্মে যে গাছ

লটা — লোটা / ঘটি

ভেড়ি খোসা — ভেড়ার লোমের কম্বল।

সিম্বি — সিম

কিতাব — বই, পুঁথি

ফজির — ভোর

আদমী — পু(ষ মানুষ

জানি — মহিলা

আশ্রা — আশা ভরসা

গোসোয়া — শুখা

ঠাংনকা — বজ্র

ইনজত — আলো

ছাঁহির — ছায়া

আন্ধার — আঁধার, অন্ধকার

দিয়া — প্রদীপ, কুপিবাতি

হারিয়ালি — সবুজ রং টাকা সিক্কা — ধনসম্পদ / টাকা পয়সা

পাপলা — প্রজাপতি সিদ্ধি — শকুন।

স্বল্প পরিসরে শব্দের সংখ্যা বাড়ানো অসম্ভব অন্যান্য কথ্য ভাষার মতো এটাও খুব মাধুর্যে ভরা ভাষা। অন্যান্য ভাষার প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা রেখেও নিজের হারিয়ে যাওয়া ভাষার চর্চা করা যায়। ঐ ভাষার প্রসারের চেষ্টা করা যায়। কোনও ভাষার সঙ্গে কোনও ভাষার বিরোধ নেই বা থাকাটা যুক্তি(সংগতও নয়। ভাষার সৌন্দর্য বিকাশ সধন বা ভাষাকে লুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন নিজ ভাষার প্রতি দায়িত্বশীল যাঁরা, তারাই পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষার অধ্যয়ন করলেও প্রতিটা মানুষ নিজের মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান হলে ঐ ভাষা কিছুটা হলেও মর্যাদা পায় এবং লুপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। [৭৯]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে বরাক উপত্যকার চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা বর্হিরাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসার ফলে তাদের সংস্কৃতি, তাদের ভাষা, তাদের আচার বিচারে পার্থক্য, সুস্পষ্ট। কিন্তু বরাক উপত্যকার চা বাগানে এসে একত্র বসবাস করার ফলে ওদের সেই পার্থক্যটা এখন আর নেই। বরাক উপত্যকায় ওদের একটাই পরিচিতি চা শ্রমিক। স্বভাবতই মনে পড়ে আশু তাঁতীর গাওয়া গান —

"না হইলি আসামী

না হইলি বাঙালি

বাগানিয়া হইয়া রইলি।"

এখন ওরা বাগানিয়া বলতেই অভ্যস্ত। চা বাগানের শ্রমিকদের গাওয়া একটা গান এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি —

সকাল ৭ টা সময় গো, কামলারা চলিল চা বাগানে

কামলারা চলিল চা বাগানে।

সারাদিনটা খাটায় নিলি ৭২ টাকা হাজিরা দিলি।

চায়ে ভাতে খেয়ে হামদের পেট নাহি ভরে গো।।

কামলারা চলিল চা বাগানে।।

কোলের বাচ্চা ঘরে ছাড়ে, রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে,

চা গাছকে যত্ন করে তোদের পকেট ভরাই গো।

কামলারা চলিল চা বাগানে।।

বড় লোকের বৌ ও বেটি কাপড় পিন্দে দামী দামী।।

হামদের ঘরের মা বহিন ছিড়া কাপড় পিন্দে গো।।

কামলারা চলিল চা বাগানে।।

ধনী লোকের লেড়কা বাচ্চা বিদেশেতে পড়ে তারা

হামদের ঘরের লেড়কা বাচ্চা বাগাল খাটে মরে গো।।

কামলারা চলিল চা বাগানে।

বড়লোকের বেমার হলে নার্সিং হোমে ভর্তি করে।।

হামদের দাস্ত বখার টিবি হলেও দাওয়াই বিনা মরে গো।

কামলারা চলিল চা বাগানে।।

জাত ধর্ম ভুলাই গিয়ে গরিব মানুষ এক হয়ে,

হামদের যত অধিকার লড়াই করে লিব গো।

কামলারা চলিল চা বাগানে গো।

কামলারা চলিল চা বাগানে।।" [৮০]

লেখক — শনিচরা উরাং

সুর — বিনা উরাং।

(উল্লেখ্য গানটির মাধ্যমে চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনের ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।)

বরাক উপত্যকাকে ঘিরে বাগানিয়া ভাষায় আরেকটি গান বা কবিতা হল।

ই বরাক আসম দেশের রানী

ই বরাক রূপেতে লাবণি

কাছাড় হানির জনম মাটি

তুনহিকে মা নমি।

ই কাছাড় লাল মাটিয়ার দেশ

ই কাছাড় চায় বাগিচার দেশ

বহুত ভাষা বহুত সুরে

ঝিলমিল সাজানী।

ইথায় বরাক জিরি-চিরি

ঝরনা পাহাড় সারি সারি

বড়াইল ভূবন পাহাড় তুনহির

মাথায় মুকুট মণি।

হিয়ায় বহুত জাতির ঘর

হিয়ায় লানান ভাষায় স্বর

বাগানিয়া ঝুমুর টুসুর

সুরেতে মিলানি।

হানিকের সুখ-দুখানির গান

বানিয়া করে ছিতুর ছান

হামদের বাত, হামনিকে সাথ

আয়নো রে ভাই তুনি।[৮১]

লেখক হলেন — অভিজিত চত্র(বর্তী।

চা শ্রমিকদের সব পূজা পার্বণ, বিবাহ, জীবনের বিভিন্ন কর্ম(ে ত্রে গানের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে ওদের চিরাচরিত ঝুমুর নাচ। জীবন পথে চলতে চলতে ওরা গান রচনা করে ফেলে। গানে ফুটে উঠে ওদের জীবনের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা, আশা-আকাঙ(া। এমনই একটি গান হল —

কখন কামাল ফুল ফুটল

কখন শুকিয়ে গেল, মন খারাপ হল

অর্ধেক রাতে কামাল ফুল ফুটল

সকালে হারিয়ে গেল

কে তার খোঁপায়

গুজল কামাল ফুল

কে তোর

ফুল শুকিয়ে গেল, তোর

মন খারাপ হল

বৌদি, তোর খোঁপায়

কামাল ফুল

বৌদি

ফুল শুকিয়ে গেল

তোর বোনের মন খারাপ হল।[৮২]

(সারদি ভাষায় রচিত মদেশিয়া সমাজের জিতিয়া পরবের গান)

আরেকটি গান হল —

মেয়ের বাবা নাই

মেয়ের বাবা নাই

দেখে মনে হয় পাথরের পিণ্ড

যেন সুতো দিয়ে মোড়া পাথর পিণ্ড

তাই দেখে আমি ডুবে গেলাম

মেয়েকে দেখে আমি খুশি হলাম।'' [৮৩]

(চা বাগানের মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বিবাহের গান।)

বিবাহ উৎসবের একটি সাঁওতালি গান —

''একদিন ভালো ভালো খেয়েছ

এখন কি খাবে?

সুখ ও দুঃখের সাথী হবে

এবং সময়ে সময়ে

কাঁদতে হবে।'' [৮৪]

মানুষ সৃজনশীল জীব। প্রকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিকে। প্রকৃতির ফুল-ফল-ফসল-রং-রূপ-গন্ধ-বর্ণ তাকে উদ্দীপিত করে তোলে। নানা ঋতু

তার রূপের পসরা সাজিয়ে ধরে। তার আনন্দ তখন থরে থরে আত্মপ্রকাশ করে নৃত্যের মধ্যে, সংগীতে ছড়ায় এককথায় তার আবেগের বহিঃপ্রকাশ এগুলি। বেঁচে থাকার জন্য তাকে সচেতন হতে হয় সংগ্রামী হতে হয় চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। শিল্প সাহিত্য সংগীত এই লড়াই এরও প্রেরণা দেয়। অনেকে মনে করেন সমস্ত লোক সংগীতের মূলে আছে মেহনতের প্রভাব। [৮৫]

চা শ্রমিকদের জীবনের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে নৃত্য ও সংগীত। বিবাহ উৎসবে , ঋতু উৎসবে, ফসল কাটার উৎসবে, দেবদেবীর পূজা পার্বণে, শিকারে, পদে-পদে এইসব লোকসংগীতগুলির ব্যবহার। পূজা প্রকৃতি প্রেম ছাড়াও কর্মকেন্দ্রিক লোক সংগীতও রচনা করেন চা শ্রমিকরা।

চা শ্রমিক আদিবাসীদের সংগীত রীতিতে বেশির ভাগ গানই সম্মিলিত সুরে রচিত। তাদের সব লোকসংগীতের পেছনে আছে মেহনতি প্রেরণা। আবার বিনোদনও যে এর পেছনে কাজ করেনি তা বলা যায় না। আদিম মানুষ দলবদ্ধ জীবন যাপন করত এবং সেখানে শিকারই ছিল প্রধান বিষয়। চা বাগানে এসে ওদের জীবনে নানা পরিবর্তন হলেও লোকসংগীত বা লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ওরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন চা বাগানে খাটুনির পর বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। এই আনন্দ উৎসব ওদের জীবনের সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। জীবনে চলার পথে ওরা প্রেরণা পেয়ে থাকে এই নাচ এবং গান থেকে ওদের জীবনের প্রতিটি পদ(েপ সংগ্রামে ভরা। এই সংগ্রামের শ্রম প্রত্রি(য়ায় সামিল হয় লোকসংগীত। আমরা বলতে পারি শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে গান।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল ওইসব মূল্যবান সব গান বা সংস্কৃতি এখন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কারণ আমি বাগানে বাগানে গিয়ে একটা জিনিস প্রত্য(করেছি যে, ওদের কাছে লিখিত কোনও দলিল নেই। ওদের মুখে মুখেই সব। নতুন প্রজন্মরা হয়তো সেভাবে এগুলোকে গ্রহণ করছে না। লিখিত তথ্য না থাকায় ওদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

.....

তথ্যসূত্র

১। ড০ শিবতপন বসু, বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, প্রকাশিকা গৌরী বসু, বদরপুর, পৃঃ

২। তদেব , পৃঃ

৩। সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস, প্রকাশক - বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন। প্রথম প্রকাশ ২০১০ ইং, পৃঃ ২৯৭

৪। সা(াৎকার, ঝাউরা মুণ্ডা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, বরাক, কাছাড়, তারিখ - ৫/১১/২০১০ইং।

৫। সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকদের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা পুস্তকালয়, কলকাতা, পৃঃ

৬। সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস, প্রকাশক বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ ২০১০ ইং, পৃঃ ২৯৮।

৭। তদেব , পৃঃ ২৯৮, ২৯৯

৮। রমাপ্রসাদ বি(্বাস, বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর, সৃজন গ্রাফিকস এন্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর - ১, পৃঃ ২২

৯। ঝুমুর পাণ্ডের লেখা থেকে সংগৃহীত।

১০। সৌমেন দাস, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ ।

১১। অচিন্ত্য বি(্বাস, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা, অঞ্জলি, পাবলিশার্স ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ — আগস্ট ২০০৬, পৃঃ ৭৫।

১২। বাংলার লোকসংস্কৃতির বি(েকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর কলকাতা, সম্পাদক ড০ দুলাল চৌধুরী, পৃঃ ৪৮২

১৩। জহরকান্তি সেন, বরাক উপত্যকার টুসু গান, সাময়িক প্রসঙ্গ, রবিবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০১২ ইং পৃঃ ৫

১৪। ঝুমুর পাণ্ডের কাছ থেকে সংগৃহীত একটি লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৫। জহরকান্তি সেন, বরাক উপত্যকার টুসু গান, সাময়িক প্রসঙ্গ, রবিবার, ১৫ জানুয়ারি, পৃঃ ৫।

১৬। তদেব, পৃঃ ৫

১৭। তদেব পৃঃ ৫

১৮। বাংলার লোকসংস্কৃতির বি(েকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, সম্পাদক ড০ দুলাল চৌধুরী, পৃঃ ২৯৪।

১৯। বীরবর বড়াইক, লোকসংস্কৃতি চা বাগানের করম পূজা ও গান, শারদীয়া উধারবন্দ, পৃঃ ৫২, ৫৩।

২০। Mishra & Mishra, NET & SET, success key, Tapati publishers, kolkata - 9

২১। হামদের বাত, চা বাগানের আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকা, কবিতা, আশু তাঁতী, দেওয়ান চা বাগান, পৃঃ ৪।

২২। করমপূজার ইতিবৃত্ত ও যুক্তি(যুক্ত(তা, সং(প্ত চিন্তা, শনিচরা উরাং, রূপাছড়া, হামদের বাত, পৃঃ ৩।

২৩। সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস(প্রকাশক - বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃঃ ২৯৫।

২৪। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির কোষ, ড০ ব(ণ কুমার ডি লিট, পৃঃ ২৮৯।

২৫। তদেব, পৃঃ ২৮৯।

২৬। Mishra & Mishra, NET & SET, success key, Bengali, Tapati publishers, kolkata - 9

২৭। লোক উৎসব, বাংলার লোকসংস্কৃতির বি(ৈকোষ, সম্পাদক ড০ দুলাল চৌধুরী, কলকাতা, পৃঃ ৩১১ ।

২৮। তদেব, পৃঃ ৩১১

২৯। সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস(প্রকাশক - বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃঃ ২৯৬।

৩০। তদেব, পৃঃ ২৯৬।

৩১। ravisays, wordpress.com/2011/10/29 chhath - puja

৩২। সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস(প্রকাশক - বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃঃ ২৯৬।

৩৩। chhath From wikipidia, the free encyclopedia.

৩৪। রমাপ্রসাদ বি(াস, বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর , সৃজন গ্রাফিকস এন্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর - ১, পৃঃ ২৩।

৩৫। ড০ ব(ণ কুমার চত্র(বর্তী, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্টিবিউটরস, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ ২০১।

৩৬। রমাপ্রসাদ বি(্বাস, বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর, সৃজন গ্রাফিকস এন্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর - ১, পৃঃ ২৩, ২৪।

৩৭। The Jumur dance? Traditional Belief and cultural Identity of the tea - Labour society of Assam (Internet)

৩৮। তদেব

৩৯। ড০ জীবেশ নায়ক, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯ , প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১০, পৃঃ ২৯৭।

৪০। তদেব , পৃঃ ২৯৯।

৪১। রমাপ্রসাদ বি(্বাস, বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর, সৃজন গ্রাফিকস এন্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর - ১, পৃঃ ২৪।

৪২। শারদীয়া উধারবন্দ, পৃঃ ৫৫।

৪৩। রমাপ্রসাদ বি(্বাস, বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর, সৃজন গ্রাফিকস এন্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর - ১, পৃঃ ২৬।

৪৪। সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা পুস্তকালয়, কলকাতা।

৪৫। সা(াৎকার, কাজল দেমতা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৫/১১/২০১০

৪৬। সা(াৎকার, শনিচড়া মুণ্ডা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৫/১১/২০১০ইং।

৪৭। সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৬১।

৪৮। ঝাউড়া মুণ্ডা, সা(াৎকার, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৫/১১/২০১০ইং।

৪৯। সা(াৎকার, শনিচড়া মুণ্ডা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৫/১১/২০১০ইং।

৫০। সা(াৎকার, ঝাউড়া মুণ্ডা, সিঙ্গা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক,

তারিখ - ৫/১১/২০১০ ইং।

৫১। তদেব

৫২। সা(াৎকার , শনিচড়া মুণ্ডা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৫/১১/২০১০ইং।

৫৩। সা(াৎকার, ঝাউড়া মুণ্ডা এবং শনিচড়া মুণ্ডা, বড়সিঙ্গা চা বাগান,

তারিখ - ৫/১১/২০১০ ইং।

৫৪। ক) সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা - ৭৩, পৃঃ ৩২৭।

খ) সা(াৎকার, শনিচড়া মুণ্ডা এবং ঝাউড়া মুণ্ডা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৫/১১/২০১০ ইং।

৫৫। রতন বি(্বাস সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, ৯ এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৭৫।

৫৬। সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা - ৭৩ পৃঃ ১৫৩।

৫৭। তদেব , পৃঃ ১৫৭।

৫৮। সা(াৎকার সুখদেব হেমব্রম, চান্দখিরা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৩০/০৩/২০১৪ ইং।

৫৯। রতন বি(্বাস সম্পাদিত , উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি ও ৯ এ নবীন কুণ্ডু লেন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৭৯।

৬০। তদেব, পৃঃ ১৭৮/১৭৯।

৬১। তদেব, পৃঃ ১৮৯/ ১৯০।

৬২। সমীর চত্র(বর্তী, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা - ৭৩ পৃঃ ২৭১।

৬৩। সা(াৎকার সুখদেব হেমব্রম, চান্দখিরা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৩০/০৩/২০১৪ ইং।

৬৪। রতন বি(্বাস, উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, কলকাতা-৯,

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি - ২০০১, পৃঃ ১৮৭।

৬৫। সা(াৎকার সুখদেব হেমব্রম, চান্দখিরা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, কাছাড়, বরাক,

তারিখ - ৩০/৩/২০১৪ইং।

৬৬। বেলবতী কিসকু, চান্দখিরা, বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৩০/০৩/২০১৪ ইং।

৬৭। সা(াৎকার সুখদেব হেমব্রম, বেলবতী কিসকু, এবং আরো অনেক, চান্দখিরা,

বড়সিঙ্গা চা বাগান, তারিখ - ৩০/৩/২০১৪ইং।

৬৮। রতন বিশ্বাস সম্পাদিত , উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি ও ৯ এ নবীন কুণ্ডু লেন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৭৯।

৬৯। তদেব, পৃঃ ১৮৮।

৭০। তদেব , পৃঃ ১৮৯/১৯০।

৭১। সা(াৎকার সূর্য দেও তেওয়ারি, প্রধান পূজারি বরমবাবা মন্দির, শিলকুড়ি,

তারিখ ১০/১১/২০১১ইং।

৭২। ক) সা(াৎকার

খ) সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস(প্রকাশক - বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃঃ ২৬৬, ২৬৭।

৭৩। তদেব, পৃঃ ২৬৭।

৭৪। সা(াৎকার সূর্য দেও তেওয়ারি, প্রধান পূজারী বরমবাবা মন্দির, শিলকুড়ি,

তারিখ ১০/১১/২০১১ইং।

৭৫। সনৎ কুমার কৈরী, চা শিল্প ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস(প্রকাশক - বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃঃ ২৬৮, ২৬৯।

৭৬। তদেব, পৃঃ ২৬৯।

৭৭। কাজল দেমতা, চা শ্রমিকদের ভাষা ও সঙ্কট, সাময়িক প্রসঙ্গ, শনিবার ২৪ আগস্ট পৃঃ ৪।

৭৮। তদেব, পৃঃ ৪।

৭৯। কাজল দেমতা , চা শ্রমিকদের জনগোষ্ঠীর 'সাদরি' ভাষার উদ্ভব ইতিহাস ও শব্দ ব্যবহার, তর্পণ, ১৯ মে ২০১২, পৃঃ ১১।

৮০। লেখক শনিচরা উরাং , সুর- বিনা উরাং, চা বাগানের গান, হামদের বাত পৃঃ ৭।

৮১। অভিজিৎ চত্র(বর্তী, মাটির গান, হামদের বাত, পৃঃ ৭।

৮২। উত্তর বাংলার লোকসংগীত, সংকলন ও সম্পাদনা বেনু রায়, সাহিত্য একাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০২ পৃঃ ৪৩।

৮৩। তদেব, পৃঃ ৪৭

৮৪। তদেব, পৃঃ ৪৭

৮৫। তদেব, পৃঃ ১৫।

.....